ঘরের ঠিকানা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ত্রৈলোক্যবাবু যে-কালে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন সে-কালে এদিকে ইংরাজি শিখিবার একটা স্কুল পর্য্যন্ত ছিল না। গ্রামে একটা ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল। তাহাতে বাংলা সাহিত্য, পাটিগণিত, শুভঙ্করী, জ্যামিতি, পরিমিতি, ইতিহাস, ভূগোল এবং পদার্থবিদ্যা পড়ানো হইত। ইংরাজির নাম গন্ধ ছিল না। যে কয়জন পণ্ডিতমহাশয় ছাত্রদের পড়াইতেন তাঁহারা যমরাজের বংশধর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামান্য সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। একবার একটা অঙ্ক ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রৈলোক্যবাবুকে তাঁহার শিক্ষক এমন করিয়া হাতের ভাঙ্গা শ্লেটখানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন যে, তাহার কানায় লাগিয়া কপাল কাটিয়া যায়। বহু ভাগ্যে চক্ষু বাঁচিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষতচিহ্ন এখনও আছে।

এই বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া জীবিত বাহির হইয়া আসা কপালের কথা। বহু ক্ষতচিহ্ন সম্বল করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু একদিন এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসেন। তাহার পর হইতে জমিদারীর কাজ দেখিতেছেন। জমিদারী অবশ্য বড় নয়। তবে এই গ্রামখানি ষোল আনা একা তাঁহার। সেজন্য গ্রামের মধ্যে প্রতাপ ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কিন্তু তাহাও বুঝি আর থাকে না। কতকগুলি ছেলে যথেষ্ট ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া ভালো সরকারী চাকুরী করিতেছে এবং আরও

অনেকগুলি পড়াশুনা করিতেছে। কিন্তু এ যেন শুধুই লেখাপড়া শেখা নয়, ইহাতে শিক্ষার্থীদের চোখের রং পর্য্যন্ত বদলাইয়া যাইতেছে।

সকলের চেয়ে বেশী ভয় হইয়াছে ব্রাহ্মণ-সজ্জনদের। যাহারা আজিও তাঁহাদের দেখিয়া গড় হইয়া দণ্ডবৎ করে তাহাদের ছেলেরা লম্বা টেড়ী কাটিয়া শিষ দিতে দিতে পাশ দিয়া চলিয়া যায়,—একটা কুশল প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। এ গ্রামে ব্রাহ্মণদের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভালোই। অব্রাহ্মণদের সায়েস্তা করা তাঁহাদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। বিশেষ গ্রামের জমিদার নিজেও যখন ব্রাহ্মণ। কিন্তু বিপদ বাধাইয়াছে ত্রৈলোক্যবাবুর ছেলে বিষ্ণুরথ। সে অবশ্য নিম্ন জাতির পক্ষ লইয়া কাহারও সঙ্গে কলহ করে না; কিন্তু যখন-তখন দেখা যায় ওই শ্রেণীর কোনো-না-কোনো ছেলের কাঁধে হাত দিয়া চলিতেছে। জমিদারের ছেলে যদি এমন করে তো কী করা যায়!

কিন্তু সম্প্রতি একটা কাণ্ডে অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাঁহারা জমিদারের দরবারে আসিয়া নালিশ করিয়া গেলেন, এমন কি বিষ্ণুরথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রকাশ্যে এই অভিযোগের বিচার করিবার পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যবাবু রাত্রে তাঁহার শয়নকক্ষে বিষ্ণুরথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ত্রৈলোক্যবাবু অত্যন্ত রাশভারী লোক এবং স্বল্পভাষী। আত্মীয়-পরিজন, আমলা-কর্ম্মচারী, দাস-দাসী কাহাকেও কোনো দিন কটুকণ্ঠে তিরস্কার করেন নাই। তথাপি সকলেই তাঁহার ভয়ে অস্থির। বহির্ব্বাটিতে তাঁহার খড়মের শব্দ উঠিলে বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া যায়। বিষ্ণুরথকেও তিনি কখনো তিরস্কার করেন নাই। বস্তুতপক্ষে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎই কম হয়। সে প্রায়ই বাহিরে-বাহিরে ফেরে।

ত্রৈলোক্যবাবু শান্তকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লেখাপড়া শিখিয়া ছেলেরা এমন অবিনয়ী হইতেছে কেন?

পিতার শান্তকণ্ঠে সাহস পাইয়া বিষ্ণুরথ তাঁহাকে সকল ঘটনা বিবৃত করিল: বাঁড়ুয্যে মহাশয় স্নান করিয়া জলে দাঁড়াইয়া সুর করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। স্বর্ণকারদের মহেশের গামছা কাচার জল তাঁহার গায়ে লাগে। মহেশ এজন্য কুণ্ঠিত হইয়া ত্রুটি স্বীকার করিতেই বাঁড়ুয্যে মহাশয় রুখিয়া উঠিলেন এবং সে যে শুধু লেখাপড়ার গরমেই এরূপ করিতে সাহস করিয়াছে, তাহা বারম্বার উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। মহেশও উত্তপ্ত হইয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় যে মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা সকলকে বলিয়া দেয়। ইহাই বিপত্তির আরম্ভ ও শেষ।

অতঃপর বিষ্ণুরথ সকল মানুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে আরও যে সকল কথা বলিল তাহা কমিউনিজ্‌মের কথা। ইহার কতক সে রুসীয় পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, আর কতক তাহার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন নিত্যরূপের মুখে শোনা।

ত্রৈলোক্যবাবু বিষ্ণুরথের সমস্ত কথা ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক শ্রবন করিয়া কহিলেন, আমার এই বিষয়-সম্পত্তি, এ আমার স্বোপার্জ্জিত নয়। তুমি কি বলতে চাও, এর ওপর আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই?

—ঠিক তাই।

—কিন্তু যে তোমাদের মতের নয়, পৈতৃক বিষয় সে ছেড়ে দেবে না, দখল করবেই। আমি তাই করেছি। আমি ভাবছি তোমার কথা। এই বিষয়ের মালিক হওয়ার আগে তোমার তো একবার ভেবে দেখা দরকার।

—আজ্ঞে, সে বিষয়েও আমি মনঃস্থির করেছি।

ত্রৈলোক্যবাবু সবিস্ময়ে পুত্রের আনত কঠিন মুখের প্রতি একবার চাহিলেন। তারপর গড়গড়ার নলটা মুখে তুলিয়া লইলেন।

বিষ্ণুরথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ব্রাহ্মণ-সজ্জনদের অভিযোগের কোনো প্রতিকার ত্রৈলোক্যবাবু করিলেন না। বুঝিলেন, পুত্রের সঙ্গে তাঁহার অনৈক্য একেবারে মূলগত। ইহার আর মাঝামাঝি পন্থা নাই। পক্ষান্তরে যে পুত্র পৈত্রিক বহুমূল্য সম্পত্তি ত্যাগ করার সম্বন্ধে মনঃস্থির করিয়াছে তাহাকে শাস্তি দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। সুতরাং শত্রু না হাসাইয়া চুপ করিয়া যাওয়াই ভালো।

বলা বাহুল্য তাঁহার এই নিশ্চেষ্টতায় ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিল, ত্রৈলোক্যবাবু নিজে যত শাস্ত্রপরায়ণই হউন না কেন, পুত্রের ক্রোধকে ভয় করিয়া চলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ আক্রোশে কয়েকদিন ঘোঁট পাকাইয়া অবশেষে তাঁহারাও একদিন এই অপ্রীতিকর ব্যাপার বিস্মৃত হইলেন।

বড়দিনের ছুটি শেষ হইল। সকল প্রকার দুষ্কার্য্যের যাহারা পাণ্ডা তাহারা কলেজে চলিয়া গেল। কিছু দিনের জন্য গ্রাম ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু সেও বেশী দিনের জন্য নয়। কয়েক মাস পরেই গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইলে বাহিরের ছেলেরা হুড়্ হুড়্ করিয়া আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল, এবং এক সপ্তাহও অতিক্রান্ত হইল না, দেখা গেল ইহারা একখানা খাতা বগলে করিয়া চাঁদা সংগ্রহে বাহির হইয়াছে। অগ্রে নিত্যরূপ, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া চলিয়াছে, পিছনে কলেজের অন্যান্য ছেলেরা এবং তাহাদের পিছনে স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা।

গ্রীষ্মকালের বেলা, একটুতেই রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে। ত্রৈলোক্যবাবু ভিতরে স্নান করিতে যাওয়ার জন্য উঠিতেছিলেন। এমন সময় নিত্যরূপ সদলবলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। ত্রৈলোক্যবাবুর ভিতরে যাওয়া হইল না। নিজের পৃথক আসনে বসিয়া তিনি সকলকে বসিতে বলিলেন।

নিত্যরূপ অনতিদূরে একখানা আসনে বসিল। ত্রৈলোক্যবাবুর সম্মুখে ছেলেরা কোনো দিনই বড় একটা ভিড়িত না। তাহারা কেহ থামের আড়ালে, কেহ সিঁড়ির পৈঠায় পিছন ফিরিয়া নিরাসক্ত ভাবে বসিল, কেহ বা সম্মুখের কলমের আমগাছটির অর্দ্ধপক্ক আম্রগুলির প্রতি লোলুপ নেত্রে চাহিতে লাগিল।

নিত্যরূপ নিঃশব্দে কেবলই খাতা উল্‌টাইতেছে দেখিয়া ত্রৈলোক্যবাবু নিজে হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপর? চাঁদা?

—আজ্ঞে, দীঘির পঙ্কোদ্ধার না করলে তো আর চলছে না। ঘাটের গোড়াতেই এক হাঁটু পাঁক। জলও হ'য়েছে তেমনি, কাদাগোলা। অথচ, গ্রামের আর কোনো পুকুরে একটি ফোঁটাও জল নেই। লোকে স্নানই বা করে কোথায়? খাবার জলই বা আনে কোথা থেকে? সেজন্যে ভাবছি ...

মধ্য পথে বাধা দিয়া ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, তা তোমরা তো এসেছ হপ্তাখানেক হ'ল। এর আগে লোক স্নান করত কোথায়?

নিত্যরূপ হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে ওই খানেই। আমরা যদি চাঁদা তুলে পঙ্কোদ্ধার না করি তাহ'লে গ্রীষ্মভোর ওই জলই খাবে। যখন তাও মিলবে না, তখন গাড়ীতে ক'রে পাশের গ্রাম থেকে জল আনবে। তবু নিজেরা উৎসাহ ক'রে কোনো কাজ করবে না। এত বড় গ্রাম, বাড়ীপিছু একজন ক'রে লোক যদি কোদাল ধরে, পঙ্কোদ্ধার হ'তে

কতক্ষণ? একটি পয়সাও খরচ হয় না। কিন্তু তা তো হবে না। স
ফাঁকির ওপর চলতে চায়।

নিত্যরূপ হয়তো আরও অনেক কথাই কহিত। কিন্তু ত্রৈলোক্য
বাবুর মতো গম্ভীর লোকের মুখেও কৌতুকের ক্ষীণ রেখা ফুটিতে দেখি
থামিয়া গেল।

ত্রৈলোক্যবাবু হাস্য দমন করিয়া কহিলেন, এখন আমাকে কি করতে
হবে?

নিত্যরূপ কিছুই না বলিয়া শুধু চাঁদার খাতাটা উল্টাইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্যবাবু কহিলেন, কিন্তু আমি তো দীঘিতে স্নান করি না
আমিও না, আমার বাড়ীর কেউও নন। আমার বাড়ীতে ইন্দার
রয়েছে। খাওয়ায়, স্নানে আমরা সবাই সেই জল ব্যবহার করি।

আম গাছের আশে পাশে যাহারা ঘুরিতেছিল এ কথা শুনিয়া তাহার
সরিয়া পড়িল। এবং থামের অন্তরালের ছেলেগুলি সিঁড়ির ছেলেগুলি
পাশে সরিয়া আসিল।

কিন্তু নিত্যরূপ তথাপি হাল ছাড়িল না। কহিল, তাহ'লে
সাধারণের উপকারের জন্যে....

বাধা দিয়া ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, ঠিক। কিন্তু নিত্যরূপ, তোমরা
আজকাল ইংরিজি লেখাপড়া শিখছ। তোমাদের মুখে নিত্য নতুন কথা
শুনতে পাই। তোমরা দেব-দ্বিজ মান না, জমিদারের অধিকার স্বীকার
কর না, তোমাদের কাছে প্রত্যেক মানুষের অধিকার সমান। দীঘির
পঙ্কোদ্ধারে আমার কোনো স্বার্থ নেই। আমাকে যদি চাঁদা দিতে হয়
তো প্রজাদের স্বার্থের জন্যে। কিন্তু জমিদারে প্রজায় সে সম্পর্ক তো
তোমরা রাখতে চাও না।

নিত্যরূপ চুপ করিয়া রহিল। চাঁদা আদায় করিয়া তাহার বুদ্ধি পাকিয়

গিয়াছে। সাধারণের কাজে নামিতে গেলে পাঁচ জনের পাঁচ কথা শুনিতে হয়। যে ইহা না পারে তাহার সাধারণের কাজে নামাই ভুল।

ত্রৈলোক্যবাবু আবার বলিলেন, যে-দীঘির আজ তোমরা পঙ্কোদ্ধারের আয়োজন করছ, সে দীঘি আমারই পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি। তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে অত বড় ব্যয় বহন ক'রেছিলেন, আর আমি তার পঙ্কোদ্ধারও করতে চাই নে। কেন জান? তোমাদের ওই বড় বড় বক্তৃতার জন্যে। শুধু ওই দীঘি নয়, এই গ্রামে এবং মাঠে যত পুষ্করিণী আছে তার শতকরা নব্বইটা জমিদারেরই দান। তাঁরা প্রজা ঠেঙ্গিয়ে খাজনা আদায় করতেন, কোথাও কোথাও অত্যাচার যে না করতেন তাও নয়, কিন্তু তারপরে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা রেখে নিশ্চিন্তে সুদ উপভোগ করতেন না। তার অধিকাংশই দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, রাস্তা-ঘাট মেরামতে ব্যয় করতেন। তোমরা আজকে সে বিধান উল্‌টে দিতে চাও! প্রজায় রাজায় আজকে শুধু খাজনার সম্পর্ক। পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ আজ তাই জমিদারের নয়। তার জন্যে চাঁদা তোলার প্রয়োজন। কিন্তু কত চাঁদা ওঠে শুনি? তোমার খাতাটা দেখতে পারি?

প্রায় পঞ্চাশ জন চাঁদায় সহি করিয়াছেন। মোট পোনেরো টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। খাতাখানা ত্রৈলোক্যবাবু ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। একটু শ্লেষের সঙ্গে হাসিয়া কহিলেন—

—এ গ্রামে প্রায় হাজার ঘর লোক হবে। তার মধ্যে দুশো ঘর হাড়ি, বাগ্‌দী, মুচি ইত্যাদি। তারা দিন আনে দিন খায়। জনহিতায় একটা দিনও স্বেচ্ছায় বেগার দিতে রাজি হবে না। আরো দুশো ঘর নিঃস্ব। তাদেরও বাদ দাও। বাকি সাতশো ঘরের মধ্যেও অনেকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ধরে নিলাম তারা দেবে। তাহ'লেও যে

পড়্তায় চাঁদা উঠছে তাতে দুশো টাকার বেশী উঠবে না। ওতে তোমার কাজ হবে?

নিত্যরূপ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাজারের কম হবে না।

—বাকি আট শো?

নিত্যরূপ ঘাড় চুলকাইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্যবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, দুটো টাকা আমার নামে ফেলো। কাল যে কোন সময় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

বলিয়া খড়মের শব্দ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বহুক্ষণ অস্বস্তি ভোগের পর ছেলেগুলি যেন বাঁচিয়া গেল। কেবল নিত্যরূপ কি যেন চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

২

এত বড় একটা ব্যাপারের ভার লইয়া নিত্যরূপ বিব্রত হইয়া উঠিল।

গ্রামের যে সমস্ত প্রাচীন ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়া তাহাকে এ কাজে নামাইয়াছেন, এখন তাঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না। তাঁহাদের অনেকে এখনও চাঁদার খাতায় সই পর্য্যন্ত করেন নাই। যাঁহারা এক দমে চারি আনা সই করিয়া দিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাছে নগদ কি যে আদায় হইবে ভগবান জানেন। গ্রামের অন্যান্য লোকও যে খারাপ তাহা নয়, কিন্তু ইদানি নিত্যরূপ অথবা তাহার দলবলকে দেখিলে সকলেই গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া নিত্যরূপ

মুষড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার দলের সকলেই ছোট। তাহাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু শুধু উৎসাহে তো পুষ্করিণীর পাঁক উঠিবে না। সকল দায়িত্ব তাহারই। আর সে দায়িত্ব কম নয়। উপযুক্ত পরিমাণ চাঁদার অভাবে যদি পঙ্কোদ্ধার না হয়, যাহারা চাঁদা দেয় নাই তাহারাও সেদিন নিন্দা করিতে ত্রুটি করিবে না। যেন একটা সাধু সঙ্কল্প করিয়া নিত্যরূপই চোর হইয়াছে।

সেদিন সকালে নিত্যরূপ কুম্ভকার পাড়ায় গিয়াছিল। সঙ্গে বিষ্ণুরথ ছিল বলিয়াই রক্ষা। নহিলে হয়তো কেহ দেখাই করিত না। তাহারা জমিদার-নন্দনের কাছে কাঁদিয়া পড়িল, চাঁদা দিবার শক্তি তাহাদের নাই।

বিষ্ণুরথ বলিল, সে বললে তো হবে না। পাঁচজনের কাজ, তোমাদেরই স্নান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে। চাঁদা না দিলে চলবে কি ক'রে?

বিষ্ণুরথ জানে, তাহার পিতামহের শ্রাদ্ধের সময় শুধু এই একটা পাড়া হইতেই এক শত টাকা উঠিয়াছিল। তাহার চেয়ে এ কাজ কত জরুরী। কিন্তু সে জানে না, ইহারা জমিদারের হুকুমে প্রয়োজন হইলে একশত কেন দুই শত টাকা উঠাইয়া দিতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী কাজেও স্বেচ্ছায় একটা টাকাও দিতে পারে না। চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে যে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই সে সংবাদ ইহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। তাই বিষ্ণুরথের কথায় ইহারা আর একবার হাত জোড় করিল।

এ কাকুতিতে নিত্যরূপ এবং বিষ্ণুরথ উভয়েরই মন গলিল। বেচারীরা সত্যই যে বড় গরীব সে বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই।

নিত্যরূপ খানিকক্ষণ দম ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল, আচ্ছা, চাঁদা তোমাদের দিতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ী থেকে

সপ্তাহে একজন ক'রে বেগার দিতে হবে। তাতে তো'আর পয়স খরচ নেই।

কুম্ভকারেরা তথাপি হাত জোড় করিয়াই র'হিল। কহিল, আজ্ঞে বাবু, তাহ'লে গলায় পা দেওয়া হবে।

ব্যাপারটা সমাধা হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া নিত্যরূপ উঠিতেছিল বিস্মিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেন?

—আজ্ঞে, ম্যালোয়ারীর অত্যাচারে পাড়ার একটা মুনিষ তাজ নেই। একদিন ভালো থাকে তো সাত দিন আর উঠতে পারে না।

—তবে তোমাদের জমি চাষ ক'রে দেয় কে?

—আজ্ঞে, যা নিতান্ত না করলে নয়, তা না ক'রে উপায় কি?

বিষ্ণুরথ রাগিয়া বলিল, ও! ভেবেছ শুধু আহারের ব্যবস্থা করলে হ'ল? পানীয় জলের ব্যবস্থা করা বুঝি কিছুই নয়? পানীয় জলে সুব্যবস্থা নেই ব'লেই তো এত ম্যালেরিয়া। দীঘি সংস্কার না কর বারোমাস এমনি ভুগতে হবে।

নিত্যরূপের দলের অপর একজন তর্জ্জনী আন্দোলিত করিয়া কহি আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে চাঁদা চাইতে আসিনি। বুঝেছ পালজি

পালজি জিভ কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে, বাবু মশাই, ও কথা যদি মনে এনে থাকি, আমার জিভ যেন খ'সে যায়!

নিত্যরূপ তাহাকে নরম দেখিয়া আশ্বস্ত ভাবে কহিল, তাহ'লে মুনিষের কথাই ঠিক রইল তো?

পালজি আবার হাত জোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে, ঘর পিছু সপ্ত একটা ক'রে মুনিষ পারব না।

নিত্যরূপ ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। কহিল, তাহ কি পারবে তাই শুনি?

পালজি বার কয়েক হাত কচ্‌লাইয়া, কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি একা আর কি ক'রে বলি? পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় আপনাকে দু'তিন দিনের মধ্যে জানাব।

বলিয়াই চট্‌ করিয়া একটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, আজ্ঞে, তাও ব'লে রাখি, বড় পালজির কথা আমি বলতে পারব না। আমি এই আমাদের সাত ঘরের কথা বলতে পারি।

—সে আবার কি কথা! তোমার সহোদর ভাই....

ছোট পালজি মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, আজ্ঞে, ওদের সঙ্গে বাক্যালাপ নেই।

ইহার দিন কয়েক পরে একদিন ছেলেরা আসিয়া শ্রান্ত দেহে নিত্যরূপের বৈঠকখানায় বসিল। বেলা তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রে সকলের মুখ ঝল্‌সিয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কল কল ধারে ঘাম ঝরিতেছে। কয়দিন মাত্র ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছে,—এই কয়দিনেই দেহের ত্বক কর্কশ ও বর্ণ তাম্রাভ হইয়াছে। ছেলেরা যে যেখানে পারিল বসিয়া আঁচল ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল।

সম্মুখের ঘরটি নিত্যরূপের পড়িবার ঘর। চারিদিকে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া বড় বড় আলমারী, বইতে ঠাসা। মধ্যে একটি টেবিল। এখানে বসিয়া সে পড়ে। ওদিকে একটি সোফা। মাথার দিকে একটি টিপয়। একদিকের দেওয়ালে একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র। ঘরের দেওয়ালে যে কয়খানি বাছাই-করা ছবি টাঙানো আছে, তাহাতেও তাহার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

নিত্যরূপের বাবা পশ্চিমের একটা কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। নিত্যরূপ ছেলেবেলায় সেইখানেই মানুষ। সে যখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে, সেই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর নিত্যরূপের জননী একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে করিয়া দেশে চলিয়া আসেন। ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ করিয়া নিত্যরূপও পশ্চিমের কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় ভর্ত্তি হয়। পিতার জীবন বীমার টাকার সুদে এবং দেশের জমিজমার আয়ে তাহাদের সংসার এক রকম ভালোই চলিয়া যায়। পল্লীগ্রামে সংসারের খরচ তো বেশী নয়। মোটা খরচের মধ্যে তাহার এম, এ, পড়ার খরচ। কিন্তু কয়েকজন পিতৃবন্ধু অধ্যাপকের কৃপায় যে দুইটা টুইশান জুটিয়াছে তাহাতে বাড়ী হইতে আর এক পয়সাও পাঠাইতে হয় না।

এ সব বিষয়ে পাড়াগাঁয়ে থাকার সুবিধা অনেক। কেবল মুস্কিল হইয়াছে কাজলীকে লইয়া। বছর ষোলোর বেশী তার বয়স নয়; কিন্ত পশ্চিমের সস্তা দুধ-ঘি এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্যই হোক, অথবা যে কোনো কারণেই হউক, দেখিতে আঠারো-উনিশের কম লাগে না। পল্লী-গ্রামে ব্রাহ্মণের ঘরে এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে থাকিলে পাঁচ জনের কাছে পাঁচ কথা শুনিতেই হয়। নিত্যরূপের জননী মাঝে মাঝে এ জন্য উতলা হইয়া উঠেন। কিন্তু নিত্যরূপ কোনো কথা গায়েই মাখে না। সে পণ করিয়াছে, বোন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার আগে কোনো মতে বিবাহের কথা তুলিবে না।

কাজলী পড়িবার ঘরে বসিয়া দাদার দেওয়া 'টাস্ক্' তৈরী করিতেছিল। এতগুলি লোকের পদশব্দে বাহিরে আসিয়া তাহাদের রৌদ্রদগ্ধ মুখের অবস্থা দেখিয়া গালে হাত দিল।

—এই ডাকাতের দল নিয়ে সমস্ত রোদ্দুরটা কোথায় কোথায় ঘুরলে? মুখ যে ক'দিনেই কালী বর্ণ হ'ল!

কাজলী দাদার মতো অতখানি ফর্সা নয়। কিন্তু মুখের গড়ণ দাদার চেয়ে ঢের ভালো। ছোট্ট মসৃণ ললাট, ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ, ভ্রূ দুইটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। ছেলেরা সত্যই একবার বাতাস খাওয়া ভুলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল।

নিত্যরূপ হাসিয়া বলিল, ডাকাতের দলই বটে! তুই চট্ ক'রে ভেতর থেকে একটা বড় ঘটিতে ক'রে এক ঘটি জল, আর একটা গ্লাস নিয়ে আয় তো। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

কাজলী ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া একটা বাটিতে করিয়া এক বাটি গুড়, এক ঘটি জল ও একটা গ্লাস আনিল। দেখিতে দেখিতে সব নিঃশেষ হইয়া গেল, তবু তৃষ্ণা মিটিল না। কাজলী আর এক ঘটি জল আনিয়া দিল।

এই তৃষ্ণার্ত্ত ছেলের দল যেন মরুভূমির মতো সমস্ত জল শুষিয়া লইল। দেখিতে কাজলার বড় কৌতুক বোধ হইতেছিল।

হাসিয়া কহিল, আজকে কত চাঁদা উঠল দাদা? একশো? দুশো?

নিত্যরূপ ম্লান হাসিয়া কহিল, ও সব হবে না রে, কাজলী! ক'দিন মিথ্যে রোদে ঘুরলাম। এদের পানীয় জলের দরকার আছে, কিন্তু কেউ নিজে এক পয়সা দিতে রাজি নয়। অন্যে ক'রে দেয় তো বেশ হয়।

কাজলী বিষ্ণুরথের দিকে অপাঙ্গে একটা খোচা দিয়া কহিল, তা বাপু, এই ক'টা টাকা তোমরাই দিয়ে নাও না। তুমি রয়েছ, বিষ্ণুদা রয়েছে, তোমরা দিয়ে দিতে পার না?

—তুই কী বলিস কাজলী! আমাদের যা দেবার তা আমরা দোব, যা খাটতে হয় তাও খাটব, কিন্তু সবটা দোব কেন? পাবই বা কোথায়? আর পেলেই বা দোব কেন?

কাজলী আবার হাসিয়া কহিল, দেবেই না বা কেন? রোদ্দুরে লোকের দোরে-দোরে ঘুরে জ্বর করবে তো? তাতেই ও টাকাটা বেরিয়ে যাবে।

এ উত্তরে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিষ্ণুরথ যে বড় লোকের ছেলে, তার পিতা যে জোর করিয়া প্রজার কাছ হইতে খাজনা আদায় করেন—এই লজ্জায় পাঁচজনের মধ্যে সে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সে বুঝিয়াছিল, টাকাটা বিশেষ করিয়া তাহাকেই দিবার জন্য কাজলী ইঙ্গিত করিয়াছিল। তাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিয়া ছিল। এখন মুখ তুলিয়া কহিল,—

—কাজলী, নিত্যদা টাকা পাবেন কোথায়? আমিই বা পাব কোথায়? টাকা যদি থাকে, সে বাবার, আমার নয়। কিন্তু সে কথাও নয়। শুধু দীঘি সংস্কারই তো আমাদের লক্ষ্য নয়। মানুষের মনে civic sense জাগাতে হবে। বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ হাওয়া, পর্য্যাপ্ত আলো, ভালো রাস্তাঘাট,—আহার এবং বস্ত্রের মতোই এগুলোও মানুষের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। সেই কথাটাই যে তারা বুঝতে চাচ্ছে না।

কাজলী মৃদুকণ্ঠে কহিল, বুঝতে চাচ্ছে না, টাকা নেই বলে।

—টাকা নেই? নকড়ি ঘোষ ন'বছরে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জই ক'রে ফেললে। সে টাকার দায়ে হয়তো বেচারা সর্ব্বস্বান্ত হবে। কিন্তু তবু বিয়ে দেওয়াই চাই। কারণ পরলোকের সম্বন্ধে তার sense জেগেছে। তার মনে বিশ্বাস জেগেছে নবম বৎসরে গৌরীদান না করলে স্বর্গের একটা বিশেষ কোণে জায়গা পাবে না। কাজেই, beg, borrow or steal, যে কোনো প্রকারে মেয়ের বিয়ে তাকে ওই বৎসরে দিতেই হবে। মুক্ত আলো-বাতাস এবং

বিশুদ্ধ পানীয় সম্বন্ধে সেই বুদ্ধি যদি তার জাগত, আমাদের কিছুতে ফেরাতে পারত না।

একটু থামিয়া বিষ্ণুরথ তেমনি উজ্জ্বল চোখে আবার বলিল, টাকা নেই? কিন্তু আমরা সকলের কাছে টাকাইতো চাই নি। যার আছে তারই কাছে চেয়েছি টাকা,—যার নেই তার কাছে চেয়েছি দেহের পরিশ্রম। কিন্তু এরা তাও দেবে না, একেবারে ফাঁকির ওপর সব কিছু চায়।

তথাপি কাজলী যে ইহাদের দুঃখ উপলব্ধি করিল তাহা মনে হইল না। সে তেমনি পরিহাসচটুল চোখে চাহিয়া কহিল, তাহ'লে যতদিন না civic sense জাগে ততদিন কি করবে ঠিক করেছ? অপেক্ষা করবে?

বিষ্ণুরথ এই পরিহাসের উত্তর দিল না, শুধু ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল।

জবাব দিল নিত্যরূপ। কহিল, অপেক্ষাই করতে হবে দিদি। গায়ের জোরে তো শুভবুদ্ধি জাগানো যাবে না; তবে অপেক্ষাও আর বেশী দিন করতে হবে না। এ বছরটাও পাঁকে জলে পাবে, আসছে বছরে তাও যখন পাবে না, তখন দেখিস ওরাই আবার আমাদের কাছে আসবে নিজে থেকে।

ওপাড়ার কথা মনে পড়ায় নিত্যরূপ আপনার মনেই হাসিয়া ফেলিল।

—দীঘির জলের ওপর গোটা গাঁয়ের জীবন নির্ভর করছে,—শুধু এ পাড়ার নয়। গেল বছর আমরাই লেখালেখি ক'রে জেলাবোর্ড থেকে ওপাড়ায় একটা ইন্দারা করিয়ে দিয়েছিলাম। এবারে শুনলাম, কে একটা ছেলে তার মধ্যে একটা মরা কুকুর-ছানা ফেলেছিল। দুর্গন্ধে চারি পাশের লোকের টেঁকা দায় হয়েছিল। তবু সবাই এমনি ব্যস্ত, যে

সেটাকে কেউ বার ক'রেও ফেলে দেয়নি। দেখে এলাম সেখানে চমৎকার ব্যাঙের চাষ হচ্ছে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

কাজলী কহিল, তাই ব'লে চোরের ওপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাবে? কাল যে কলেরা আরম্ভ হবে। তখন?

নিত্যরূপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়ামোড়া দিয়া বলিল, তখন আমরা রোজ রাত্তিরে জাঁকালো ক'রে হরিনাম সংকীর্তন বার করব। তিনিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। কিন্তু সেও তো এখনো নয়। আজ স্নান ক'রে খেয়ে নেওয়া যাক। কি বল?

বলিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিল। তাহারাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বেলা অনেক হইয়াছে।

সেদিন অপরাহ্নে,—তখনও রৌদ্রের বেশ তেজ আছে,—নিত্যরূপ কাজলীকে পড়া বুঝাইয়া দিতেছিল। বিষ্ণুরথ ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, আর কেউ এখনও আসেনি?

বই হইতে মুখ তুলিয়া নিত্যরূপ বলিল, এই তো সবে চারটে বাজল। আসবে সব একে একে পাঁচটার মধ্যে।

নিত্যরূপ কাজলীকে পড়াইতে লাগিল। বিষ্ণুরথ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কাজলী প্রাণপণে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিয়াও উস্ খুস্ করিতে লাগিল। এবং কিছুক্ষণ এই ভাবে অস্বস্তি ভোগের পর হঠাৎ বলিল, আজকে এই থাক দাদা। আবার সন্ধ্যের পর।

নিত্যরূপ বই পড়াইতে পড়াইতে বলিল, আর একটুখানি। Iridescent মানে কি?

—জানি না।

বলিয়া কাজলী একেবারে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিতভাবে নিত্যরূপ বলিল, কি হ'ল?

বিষ্ণুরথকে কাজলী ফাঁকি দিতে পারিল না। সে আসা পর্য্যন্ত কাজলীর অস্বস্তি লক্ষ্য করিতেছে। কাজলী যেন কিছুতে পড়ায় মন দিতে পারিতেছে না। নিত্যরূপ কোনো প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে গিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে।

বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি কহিল, আমার কাছে লজ্জা কি?

নিত্যরূপ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, পড়াশুনোয় আবার লজ্জা কি? ওই তো তোদের দোষ! তোরা পাড়ায় পাড়ায় ছেলে কোলে ক'রে বেড়াতে পারিস, আর যত লজ্জা পড়ার সময়। কাবুলীওয়ালার সামনে মাথায় ঘোমটা দিবি না, অথচ ভদ্রলোককে দেখে লজ্জার শেষ নেই।

এই বয়সের সকল ছেলের মতো বক্তৃতা দেওয়া নিত্যরূপের একটা রোগ।

কাজলী তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, আহা, তাই বুঝি! তুমি যে একবার পড়াতে আরম্ভ করলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। কখন থেকে পড়াচ্ছ বল তো?

কিন্তু এ কথা সত্য নয়। মেয়েদের একটা বয়স আছে যখন কোনো বিশেষ বয়সের ছেলের কাছে বিদ্যার পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করে। হয়তো আশঙ্কা ক'রে ইহাতে তাহাদের রহস্যের মায়াজাল ছিঁড়িয়া যাইবে। কিংবা হয়তো সহজ সংস্কারবশেই এরূপ করে।

বিষ্ণুরথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া এক সময় বলিল, নিত্যদা, আমি শ' পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা করেছি।

একটি দ্বিপ্রহরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ' পাঁচেক টাকা! নিত্যরূপ এবং কাজলী উভয়েই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

নিত্যরূপ জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম?

বিষ্ণুরথ ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া বলিল, টাকাটা মা দিচ্ছেন। আজকে দুপুরে আমার মুখ চোখের অবস্থা দেখেই তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি একবার চাইতেই রাজি হ'য়ে গেলেন।

এ সম্বন্ধে কি উত্তর দেওয়া যায় তাহাই স্থির করিবার জন্য নিত্যরূপ বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। আর কাজলী নতমুখে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল, কিংবা টেবিলের ঢাকাটা সমান করিতেছিল তাহা সেই জানে।

বিষ্ণুরথ সে দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া বলিতে লাগিল, চোরের ওপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়াই বটে কাজলী। কিন্তু চোরেরও একটা স্বার্থ আছে। এরা নিঃস্বার্থভাবে নিজের অপকার করছে। ওই চার গণ্ডা, কি আট গণ্ডা পয়সা বাঁচিয়ে ওরা কিছু জমিদারী কেনবার সঙ্কল্প করেনি। আসল কথা ওরা অবোধ,—শিশুর মত অবোধ।

বিষ্ণুরথ হয়তো গড়্ গড়্ করিয়া আরও অনেক কথা ব[illegible] যাইত। কিন্তু নিত্যরূপ নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেই সে [illegible] পড়িল। এককালীন পাঁচ শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াও সে যে খুসী হইয়াছে এমন বোধ হইল না,—না সে, না কাজলী। বিষ্ণুরথ ইহাদের মনের ভাবটা পড়িবার জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার ইহার একবার উহার মুখের পানে চাহিতে লাগিল। একটু পরে কাজলী বইগুলি গুছাইয়া একধারে রাখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। এবং আরও কিছুক্ষণ পরে

নিত্যরূপ ভিতরে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, একটু বোসো, আমি আসছি।

আর একা ঘরে বিষ্ণুরথ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে এমনটি আশা করে নাই।

একটু পরে কাজলী ফিরিয়া আসিল। এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল, হঠাৎ তোমার মা পাঁচশো টাকা দান ক'রে বসলেন যে! ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এমন দানের ঘটা ক'রেছেন ব'লে তো শোনা যায় নি!

প্রশ্নটা আকস্মিক, এবং অত্যন্ত রূঢ়। বিষ্ণুরথ তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে চাহিল। কিন্তু ত[illegible] নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল।

কহিল, এবারে বোধ হয় বছরটা ভালো, তাই।

কাজলী কিন্তু যেন কলহ করিবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিল।

কহিল, এমনি ক'রে মায়ের কত টাকা খসিয়েছ? অনেক?

—অনেক বই কি! তাঁর টাকাও যে রয়েছে অনেক। খসাব না?

কাজলী অধর টিপিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে দৃঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া চাপা গলায় কহিল, বিশেষ ছেলে যখন এমন গুণবান।....কি বল? আচ্ছা, এখনও তো সবাই জানে তুমি খুব সচ্চরিত্র? না, কথাটা জানাজানি হ'য়েছে?

বিষ্ণুরথের মুখে অকস্মাৎ কে যেন কালি লেপিয়া দিল। ক্রোধে ও লজ্জায় সে নিঃশব্দে ফুলিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া কাজলী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কহিল, কিন্তু পাঁচশো টাকা মায়ের কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে দীঘির পাঁকে ঢাললে তো আমার মন গলবে না। উচিত ছিল আমার জন্য দু'খানা গয়না গড়িয়ে নিয়ে আসা।

কাজলী মুখে আঁচল চাপা দিয়া মনোহর ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। সে হাসি দেখিয়া রাগে বিষ্ণুরথের পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

কহিল, আমার হাত থেকে গয়না নেবার ভাগ্য তো তুমি করনি কাজলী। সে অনেক পুণ্যের কাজ। আচ্ছা তুমি আমাকে বারে বারে অমন খোঁটা দাও কেন? মানুষ কি মানুষকে ভালবাসে না? সে কথা মুখে আনাই কি এমন বড় অপরাধ?

মুখ ফিরাইয়া কাজলী কহিল, না, খুব ভালো কাজ। ভদ্রলোকের মেয়েকে নির্জ্জনে পেয়ে····

ঝাঁঝের সঙ্গে বিষ্ণুরথ বলিল, ভদ্রলোকের মেয়েকেই ভদ্রলোকের ছেলে বলে····বলে নির্জ্জনে। এ কথা কেউ হাটের মধ্যে বলে না। তাই ব'লে লজ্জা যে কিছু নেই তাও নয়। আমি অপাত্রে মনের কথা নিবেদন ক'রে নিজের আত্মাকে অপমানিত করেছি, পৌরুষকে করেছি লাঞ্ছিত।

বলিতে বলিতে বিষ্ণুরথ ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

—তুমি তো নিতান্ত সাধারণ একটা মেয়ে,—কিছুই তোমার নেই। ভেবেছিলাম আমার দান পেয়ে তুমি অনুগৃহীত হবে। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধি শুধু কম নয়, প্রলয়ঙ্করী। আমার দান নেবে তোমার সাধ্য কি!

কাজলী এতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন ফিরিয়া চাহিল। বিষ্ণুরথ আরও হয়তো কিছু বলিত, কিন্তু সে-চাহনি দেখিয়া তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল। ভয় হইল, এখনি বুঝি কাজলী আহতা ব্যাঘ্রীর মতো তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু কাজলী কিছুই

বলিল না। অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই কথাগুলি কাজলীকে সময় ও সুযোগ পাইয়া শোনাইবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেই তাহার মনে ছিল। আজ সে সুযোগ মিলিয়া গেল। যত কথা শোনাইবার ছিল সব শোনানো আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু ইহাতেই যে কাজ হইয়াছে কাজলীর মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা গেল। সে কথা বুঝিয়া তাহার মন হাল্‌কা হইল।

একটু পরে নিত্যরূপ চিন্তিত মুখে ফিরিয়া আসিল। পাঁচ জনের জন্য চিন্তা করা এবং পাঁচ জনের কাজে পরিশ্রম করা তাহার একটা রোগ। চেয়ারে বসিয়া এ-বই সে-বইএর পাতাগুলি কিছুক্ষণ ধরিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া অবশেষে সে কহিল,—

—আমি ভেবে দেখলাম বিষ্ণু, তোমার মায়ের ওই পাঁচশো টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারি না। তুমি জানো, ধনীর দান আমি গ্রহণ করি না। বহু লোকের বহু ছোট-খাটো দান নিয়ে আমি বড় জিনিষ গড়তে চাই। সাধারণের ব্যাপারে একজনের মাৎসর্য্যকে প্রশ্রয় দিতে চাই না।

বিষ্ণুরথও টাকাটা লইবার জন্য জেদ করিল না। নিঃশব্দে ও নত নেত্রে বসিয়া রহিল।

নিত্যরূপ বলিতে লাগিল, একজন পুকুর দান ক'রে গেছেন। সেই দানের মর্য্যাদা রক্ষা করার শক্তি এদের নেই। দুঃখ না পেলে মানুষ শক্তি অর্জ্জন করতে পারে না। দুঃখ এদের অনেক, কিন্তু দুঃখবোধ নেই। যেটুকু আছে, দাতার এককালীন দানে তাও যাবে ম'রে। তার চেয়ে এরা দুঃখই পাক,—যতক্ষণ না সে দুঃখ অসহ্য হ'য়ে উঠছে।

বিষ্ণুরথ তথাপি কোনো কথা কহিল না।

নিত্যরূপ আবার বলিল, আমি কি ভাবছি জানো? ভাবছি তোমার বাবার কাছে যাব, এবং....

বিষ্ণুরথ সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিতরূপ বলিয়া চলিল, এবং তিনি যদি দয়া ক'রে ভার নিতে রাজি হন, তাঁরই উপর ভার দোব। ওদের দুঃখ দিতে তাঁর মতো কেউ পারবে না।

বিষ্ণু সভয়ে বলিল, কিন্তু বাবা যে....

নিত্যরূপ হাত নাড়িয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিয়া বলিল, না, না, যে রোগের যে ওষুধ। উনি ছাড়া ওদের রোগ সারাতে আর কেউ পারবে না যে! আছেন তিনি বাড়ীতে? তাহ'লে তাঁর কাছেই যাওয়া যাক। ওঠ।

বিষ্ণুরথ উঠিল, কিন্তু হাত জোড় করিয়া বলিল, আপনিই যান নিত্যদা; আমাকে আর টানবেন না।

নিত্যরূপ হাসিয়া বলিল, কেন? ভয় করে? আমার বাবা তো আমার সঙ্গে দাবা খেলতেন। আচ্ছা, তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি গেলেই ভালো হবে। ছেলেরা যদি আসে তাদের এইখানে অপেক্ষা করতে বলবে। আমার বেশী দেরী হবে না।

নিত্যরূপ চলিয়া গেল। একটি, দুটি, করিয়া অনেকগুলি ছেলেও আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যে-মেয়েটির সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করিবার জন্য বিষ্ণুরথ মনে-মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে আর আসিল না। কোনো দিন এই প্রগল্‌ভা মেয়েটির স্পষ্ট পরিচয় সে পায় নাই। গ্রীষ্মের দিবালোকের মতো সে স্পষ্ট, সুতীব্র স্পষ্ট,—কিন্তু স্বচ্ছ নয়, মরীচিকার মতো দূরে দূরে মায়া বিস্তার করে, নাগাল পাওয়া যায় না। কাজলী সুমুখে আসে, মাথা দুলাইয়া পরিপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্য্যে উচ্চহাস্য

করে, বর্ষার ভরা নদীর মতো কল কল করিয়া বকিয়া যায়,—বহু জনের মধ্যে বসিয়া বিষ্ণুরথ চোরের মতো সন্তর্পণে চাহিয়া দেখে। কথায় কথায় যদি কখনও কথা বাড়িয়া যায়, তাহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। কেমন মনে হয় কাজলীরও তাহার উপর কিছু অনুরাগ আছে।

সে দিন অপরাহ্ণে কাজলী ওপাড়ায় কোথাও গিয়াছিল। বিষ্ণুরথদের বড় বাগানটির মধ্য দিয়া যে সরু বনপথ গিয়াছে সেইটি ওপাড়া যাওয়ার সোজা পথ। ফিরিবার পথে হঠাৎ কালবৈশাখী আরম্ভ হয়। যেমন ঝড়, তেমনি ধূলা। সে ঝড়ের ঝাপ্টায় মানুষের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, ধূলায় চারিদিক অন্ধকার, চোখ মেলিবারও উপায় নাই। দৈবক্রমে এমনি দুর্য্যোগে দু'জনে গিয়া পড়ে বাগানের মধ্যে যে মালীর ঘর আছে সেইখানে। কাজলীর অবস্থা তখন সিক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মতো। আকাশে কালো হইয়া মেঘ উঠিয়াছিল। নীচে ধূলায় বালিতে ও গাছের ঝরা পাতায় অন্ধকার। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ভয়ে কাজলীর মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল। বিষ্ণুকে দেখিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ আসে। সে প্রাণের ভয়ে একেবারে তাহার পাশ ঘেঁসিয়া কোণের মধ্যে আশ্রয় লয়।

এই সময় এবং মানসিক অবস্থা প্রেম নিবেদনের অনুকূল কিনা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন। বিষ্ণুরথ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার মনে যে কথাগুলি এত দিন ধরিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, সেই বিশেষ মুহূর্ত্তে, এমনই তাহার অবস্থা হইয়াছিল যে, শক্তি ছিল না সে উচ্ছ্বাস সংযত করে। কাজলী নীরবে তাহার সমস্ত কথা শ্রবণ করে। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা যায় নাই, মনের ভাব বুঝিবারও উপায় ছিল না। তারপর দু'ফোঁটা ঝরিয়াই বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। প্রবল হাওয়ায় অমন কালো মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল।

বিষ্ণুরথের উচ্ছ্বাসের মধ্যপথেই বাধা দিয়া কাজলী কহিল, আমার বড় ভয় করছে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে চল।

বিষ্ণুরথ নিঃশব্দে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন এই পর্যন্ত। কিন্তু তারপরে কাজলী যখনই সুযোগ পায়, চোখা চোখা বাক্যবাণ ঝাড়িয়া যায়। তাহার একটা কথারও বিষ্ণুরথ উত্তর খুঁজিয়া পায় না। এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যে এত গ্লানি উঠিতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সমস্ত গ্লানি অসহায়ভাবে মাথায় তুলিয়া লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এতদিন পরে মুখের মতো জবাব দিবার সুযোগ পাইয়া বিষ্ণুরথ উৎসাহের আধিক্যে [illegible] করিতে লাগিল। কিন্তু কাজলী আর আসিল না।

নিত্যরূপের ফিরিতে দেরী হইল না। কিন্তু [illegible] খুশী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

পিতার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইলেই আশঙ্কায় বিষ্ণুরথের বুক দুরু দুরু করে। এই দলটি জমিদার প্রথার ঘোরতর বিরোধী। বিষ্ণুরথ নিজেও তাহাদেরই পন্থী। তথাপি পরের মুখে পিতার সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা তাহার পক্ষে প্রীতিকর হয় না।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল? হ'ল না?

কোনো উত্তর না দিয়া নিত্যরূপ কম্বলের একপ্রান্তে [illegible]য়া বসিল।

—কি বললেন?

একটু ম্লান হাসিয়া নিত্যরূপ বলিল, তিনি বললেন, সকল মানুষের একই সময়ে একই সাধু ইচ্ছা হয় না। সেজন্য অপেক্ষা করতে গেলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয়। যারা কাজ করতে চায়, তাদের ঘাড়ে ধ'রে কাজ করাবার শক্তি থাকা চাই। নইলে কাজ হবে না। আমি ঘাড় ধ'রে কথাটায় আপত্তি করতেই তিনি সহাস্যে বললেন, আচ্ছা,

গায়ে হাত বুলিয়েই না হয় হ'ল। কিন্তু গায়ে সে-ই হাত বুলোলে কাজ হয়, যে ইচ্ছা করলে ঘাড়ও ধরতে পারে।

নিত্যরূপ চুপ করিল।

—তাহ'লে উনি নিতে রাজি হ'লেন না?

নিত্যরূপ কহিল, রাজি হওয়ার তো কথা নয়। উনি জানতেন, আমরা পারব না। সেই ভেবে উনি নিজেই এ কাজটা হাতে নেওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন। এ তো আর আমাদের একচেটিয়া অধিকার নয় যে আমরা ছেড়ে না দিলে তিনি নিতে পারবেন না! আজ তাঁর পাইক বার হ'ল। বললেন, কাল সকালে সবাই তাঁর কাছারীতে হাজির হবে।

একজন উত্তেজিতভাবে বলিল, আমাদের কি এই জবরদস্তিতে বাধা দেওয়া উচিত নয়?

চিন্তিতভাবে নিত্যরূপ কহিল, কি জানি! কিন্তু তাহ'লে বোধ হয় দীঘি-সংস্কারের দায়িত্ব নিতে হয়।

ছেলেরা চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিল।

৩

অতঃপর যে কাণ্ড ঘটিল তাহাকে ভোজবাজি বলা চলে।

পরের দিন সকালে গ্রামের প্রত্যেকটি প্রজা সকল কাজ ফেলিয়া কাছারীতে উপস্থিত হইল। এবং এক ঘণ্টার মধ্যে আটশত টাকা এই দরিদ্র গ্রাম হইতে উঠিবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। বড় পালজিকে

ছেলেরা এক সপ্তাহ খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারে নাই। জমিদারের কাছারীতে সেই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল। এবং পর মুহূর্ত্তেই ছোট পালজি উঠিয়া সাতটাকা চাঁদা হাঁকিয়া সগর্ব্বে বড় পালজি যেদিকে বসিয়াছিল সেদিকে চাহিল।

—পাঁচ জনের কাজ, কি বল পিসে!

—বটেই তো বাবাজি। বিশেষ বাবু যখন নিজে দাঁড়িয়েছেন, তখন আর কথা আছে? সাতটা টাকা আবার টাকা?

পিসে বাবাজির উপর টেক্কা দিয়া দশটাকার প্রতিশ্রুতি দিল।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ত্রৈলোক্যবাবুর স্তুতিগুঞ্জনে কাছারী মুখর হইয়া উঠিল। এত বড় কাজ আর যে কেহ করিতে পারিত না সে তো জানাই কথা। বাবু যে স্বয়ং এ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন ইহাতেই গরীব প্রজারা কৃতার্থ হইয়াছে।

ছোট পালজি করজোড়ে নিবেদন করিল, ছোট বাবু যখনই গেলেন তখনই বললাম, বাবু এ তো ভালো কাজ। আমার যা সাধ্যি হয় তাই করতে প্রস্তুত। কথায় বলে, জলদান। ওর চেয়ে আর পুণ্যি আছে না কি? কি বল পিসে?

—বটে তো। এক ফোঁটা পাঁক-জল তাই মানুষে [illegible] হয়ে খাচ্ছে। এবার পাচ্ছে, আসছেবার তাও পাবে না। [illegible] বাবুর দয়ার শরীর তাই....

সরকার হিসাব করিয়া জানাইল, আটশো পঁয়ত্রিশ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, ওহে বড়মোড়োল, তুমি তো এ সব কাজ ভালো বোঝো শুনতে পাই। দীঘি-সংস্কারে কি রকম খরচ হবে একটা আন্দাজ দাও দেখি?

বড় মোড়ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সে ব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ারও নয়, ওভারসিয়ারও নয়,—তাহার গুণের মধ্যে ভালো মাটির দেওয়াল দেয়। এতাবৎ এ সম্বন্ধে যে সব কথা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, আজ্ঞে হাজার দেড় হাজার হবে।

ত্রৈলোক্যবাবু মনে মনে হাসিলেন। হাজার ও দেড়হাজারের মধ্যে পাঁচ শো টাকার ব্যবধান।

কহিলেন, আচ্ছা, বাকী যা খরচ হবে সেটা আমিই দোব।

নিতান্ত ত্রৈলোক্যবাবুর মতো জবরদস্ত, গম্ভীর প্রকৃতির লোক না হইলে লোকে আনন্দের অতিশয্যে 'হরিবোল' দিত। ততখানি পারিল না বটে, কিন্তু মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, আনন্দে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

হরিশ তন্তুবায় গাঁজা খায় এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান। আনন্দের আতিশয্যে সে সেইখানেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, সাক্ষাৎ দেব্‌তা! আবার দেব্‌তা কাকে বলে! আমার ভাগ্‌নেটাকে তাই তো বলি, বাপু, কেন ওখানে দু'কাঠা জমির জন্যে লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছিস! সব বিক্রি সিক্রি ক'রে এইখানে চ'লে আয়,—রাম রাজত্বি কাকে বলে দেখে যা।

উপস্থিত সকলে টিকিশুদ্ধ মাথাগুলা নাড়িয়া ভক্তিভরে তন্তুবায়ের কথায় সায় দিল।

ইহার পরের দিন ওই হরিশকেই দেখা গেল আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলা লুকাইয়া লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া নিত্যরূপের বাড়ী প্রবেশ করিতেছে।

—মা ঠাকরুণ কই গো ?

মাতাঠাকুরাণী রান্নাঘর হইতে ডাক শুনিয়াই ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিলেন। হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মাথার কাপড় টানিয়া হাত দুইটা আল্‌গোছে রাখিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আঁচলে লুকানো বস্তুগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, এসো বাবা।

চারিদিকে চাহিয়া হরিশ কহিল, দাদাঠাকুরকে তো দেখছি না, মাঠাকরুণ? পাড়ায় বেরিয়েছেন বুঝি ?

মাতাঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, কোথায় বেরিয়েছেন তিনিই জানেন। আমাকে কি একটা কথা জানায় ? শুনাছি বাগদী পাড়ায় কার নাকি কলেরা হয়েছে। হয়তো সেখানেই গেছে।

ভালো করিয়া সিঁড়ির পৈঠায় বসিয়া হরিশ বলিল, অসম্ভব নয়, মাঠাকরুণ। ওঁর তো আত্মপর ভেদজ্ঞান নেই,—ছোট-বড়ও বাছেন না। মন তো নয়, যেন গঙ্গা জল। সামনে দিয়ে হেঁটে চলেন মাঠাক্‌রুন, মনে হয় দেবতা চলেছেন।

—দেবতার মুখে আগুন বাবা! ওকে নিয়ে আমি দিনরাত্তির সশঙ্কিত থাকি,—কখন কি রোগ টেনে আনে। তার চেয়ে ও বাইরে থাকলে আমি নিশ্চিন্তি থাকি।

হরিশ হো হো করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, উনি যে ভোলা মহেশ্বর, মাঠাক্‌রুণ। আমাদের হিসেবে তো উনি চলবেন না। আপনার দুঃখু তো হবেই মা, নন্দরাণীর কথাটা ভাবুন। দেবতা পেটে ধরায় যে অনেক ঝঞ্ঝাট!

হরিশ নিজের রসিকতায় নিজেই আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল, এ গাঁয়ে ভালো-মন্দ সব রকম

লোকই তো আছে, কিন্তু গরীব দুঃখীর ওপর অমন দয়া কখনও দেখেছেন? এই যে অত বড় বাবুরা রয়েছেন....

হরিশ আরো একটু সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় কহিল, টাকার তো তাঁদের অভাব নেই। তবু নিজেদের পুকুর সারাবার জন্যে প্রজার ওপর কি রকম চাঁদাটা চাপালেন শুনেছেন তো সব? ও টাকাটা কি আর উনিই ফেলে দিতে পারতেন না?

—তা তোমরা দিলে কেন বাছা? বললেই তো পারতে—দোব না?

হরিশ ম্লানভাবে একটু হাসিয়া কহিল, একি আমাদের পাগ্‌লা দাদাঠাকুর, মাঠাক্‌রুণ, যে দোব না বললেই রেহাই পাব? এ জমিদার। না দিলে কাল আর আমাকে এ গাঁয়ে বাস করতে হবে না। জানেনই তো!

নিত্যরূপের জননী নীরবে হরিশের আসল কথাটার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীর প্রদত্ত কিছু টাকা তাঁহার নিজের কাছে আছে। সুদে খাটাইয়া খাটাইয়া এই কয় বৎসরে তাহা বেশ মোটা টাকায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবসা তাঁহাকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে চালাইতে হয়। একবার নিত্যরূপের কানে যাইতে সে সমস্ত বন্ধকী গয়না ফেরৎ দিয়া আসিয়াছিল।

সে বলে, ধার দেওয়া ভালো। সময়ে-অসময়ে মানুষের অনেক উপকার হয়। কিন্তু এই ব্যবসা যে ক'রে তার কিছু থাকে না।

যাহারা ধারে লইতে আসে তাহারাও সেই কথা জানে। তাই নিত্যরূপ বাড়ীতে আছে কি নাই সেই সংবাদ সর্ব্বাগ্রে লয়।

হরিশ তন্তুবায় আর একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানিয়া আঁচলের খুঁট হইতে কয়েকখানা গহনা বাহির করিল,—এক জোড়া রূপার বালা-কাটা, তাহার পৌত্রের অন্নপ্রশান উপলক্ষে অল্পদিন পূর্ব্বে এক জোড়া

তোড়া তৈরী করিয়া দিয়াছিল—সেই জোড়াটি, আর তাহার বড় নাতিনীটি কয়েকদিন হইল শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে—তাহার কানের একজোড়া মাকড়ি।

সেগুলি নিত্যরূপের জননীর পাদপ্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া হরিশ সকাতরে বলিল, পাঁচটি টাকা আমার না হ'লেই নয়, মাঠাকৃরুণ। দশটি টাকা চাঁদা। তার অৰ্দ্ধেকটা কাল দিতেই হবে।

নিত্যরূপের জননী সেগুলা তুলিয়া লইলেন না। অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, এই সেদিন টাকা নিয়ে গেলে। তার একটা পয়সা সুদ পেলাম না এখনো। আর বাপু, আমার কাছে সুবিধা হবে না। টাকাও নেই।

হরিশ মুখখানি একটি চমৎকার বিনীত ভঙ্গিতে বাঁকাইয়া কহিল, দোব বই কি, মাঠাকৃরুণ। আর দশটি দিন সবুর করুন। চৈতিলীটা উঠুক। সুধু সুদ কেন, আসলও দিয়ে যাব।

বলিয়া ধূর্ত্তের মতো হি হি করিয়া আর একবার হাসিল। কিন্তু তথাপি নিত্যরূপের জননী দ্বিধা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, তুমি বরং আর কারও কাছেই দেখগে বাছা, আমার টাকাই কম আছে।

এবার হরিশ আর এক রকমের হাসি হাসিল,—অনেকটা উচ্চাঙ্গের ভক্তিমার্গের হাসি। বলিল, ও সব কথা আপনি অন্যলোকের কাছে বলবেন মা, কিন্তু হরিশ তন্ত্রবায় যে জিনিস আপনার পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছে তা আর তুলে নিচ্ছে না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিবার সময় হরিশ তন্তুবায়কে তন্ত্রবায় বলে।

নিত্যরূপের জননী আপনার মনেই কি যেন ভাবিলেন। বলিলেন, —তাহ'লে তিনটি টাকা নিয়ে যাও বাছা। পাঁচ টাকা আমার কাছে নেই। আমি কি মিছে কথা বলছি?

হরিশ সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা কি আমি বলেছি? কিন্তু পাঁচ টাকার কমে কিছুতেই হবে না যে! ওই যে বললাম....

নিত্যরূপের জননী প্রমাদ গণিলেন। এদিকে নিত্যরূপের ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। বেশী দরদস্তুর করিবার অবকাশ নাই। হরিশ যে ব্যক্তি, টাকা না লইয়া সে কিছুতেই উঠিবে না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উঠিতে হইল। জিনিসগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া ভিতরে গেলেন। বলিয়া গেলেন, দেখি, যদি থাকে তো বাছা পাবে। নইলে ফিরতে হবে ব'লে দিচ্ছি।

হরিশ কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া হাতে হাত ঘষিতে লাগিল। নিত্যরূপের জননীর ফিরিতে দেরী হইল না। একটু পরেই তিনি পাঁচটি টাকা হরিশের কাছে নামাইয়া দিলেন।

—দেখ বাছা, চৈতিলী উঠলে যেন সুদের টাকা ক'টা পাই।

হরিশ ততক্ষণে টাকা কয়টি ট্যাঁকে গুঁজিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিয়া গেল,—আজ্ঞে, সে আর বলতে হবে না।

তারপরে আরম্ভ হইল সংস্কার-পর্ব্ব।

দীঘির জলাটা পূর্ব্বে প্রকাণ্ড বড়ই ছিল? এখন মজিতে মজিতেও যাহা আছে তাহার পরিমাণ এক শত বিঘার কম হইবে না। কিন্তু তাহাতে জল কম। পঙ্কই বেশী। আর আছে দুর্ভেদ্য দাম ও কাঁটা-শেওলা। টিয়া-সবুজ রঙের জলাশ সরের মতো উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় শালুক ফুলের বড় বড় পাতা এমনভাবে উপরটা ঢাকিয়া আছে যে, জল দেখা যায় না।

উত্তর দিকের মেয়ে-ঘাট তো একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেবল মাত্র প্রথম সিঁড়িটিই এখানে যে ঘাট ছিল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তার পরেই পর্ব্বতপ্রমাণ পঙ্ক। জলের চিহ্নমাত্রও নাই। মেয়েরা সে ঘাট বর্জ্জন করিয়া পশ্চিমদিকে পুরুষ-ঘাটে হানা দিয়াছে। সেটিরও অবস্থা শোচনীয়। দুই পাশে উঁচু উঁচু পাঁকের পাহাড়ের মাঝখান দিয়া একটি মানুষের চলিবার মতো সঙ্কীর্ণ এক ফালি পথে বালি জমিয়াছে। তাও বেশী দূর পর্য্যন্ত নয়। হাঁটু জলেই স্নান সারিতে হয়।

তিন দিকের তিনটি ঘাটে দশ-বারোখানা করিয়া ডুনি পড়িয়া গেল। জল বড় বেশী ছিল না। সেজন্য মরিতে দেরীও বেশী হইল না, ব্যয়ও বেশী হইল না। এবং আরও একটি বিষয়ে আশাতীতরূপে ব্যয় সংক্ষেপ হইল। এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কেবলই টাকার হিসাব করিয়াছে। দীঘির পাঁক যে জমির সার হিসাবে কত মূল্যবান তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। জল মরিয়া যাইতেই লোকের সে খেয়ালটা হইল। তখন আর পাঁক তুলিবার জন্য খরচ করিতে হইল না। লোকে গাড়ী লইয়া আসে, নিজের খরচে পাঁক তোলে, আর জমিতে দেয়। ত্রৈলোক্যবাবু দুই-তিন সপ্তাহ জন-মজুর বন্ধ রাখিলেন। সে কয়দিন রাত্রি তিনটা হইতে সকাল আটটা এবং বিকাল চারটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত গাড়ীতে গরুতে মানুষে এবং রাত্রি বেলায় হারিকেনের আলোয় মরা দীঘিতে যে উৎসব ও সমারোহ পড়িয়া গেল, জীবিত দীঘির অদৃষ্টেও বোধ করি সেই একবার মাত্রই তত সমারোহ হইয়াছে। গানে গল্পে হাসিতে বহু মানুষের কলরবে মরা দীঘি যেন রূপকথার রাজপুরীর মতো এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল।

সকালে সন্ধ্যায় লোকে ভিড় করিয়া এই উৎসব দেখিতে আসে। বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে, ঘোষেদের দাওয়ায় এবং স্যাকরার দোকানে যে

তাস-পাশা-দাবার আড্ডা বসিত, সেগুলি দীঘির বটচ্ছায়ায় উঠিয়া আসিয়াছে। একটা দিকের চটানে ছেলেগুলা সকালে খেলে গুলি-ডাঙ্গা, বিকালে হা-ডু-ডু। পূর্ব্ব দিকের বটগাছটা ছেলেদের ঝালঝুল খেলার উৎপাতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কতকগুলি ছেলে তালপাতার ভেঁপু তৈরী করিয়া অশ্রান্তভাবে বাজাইতেছে, কোথাও কয়েকটি নগ্নদেহ বালক তালপাতার ঘুর্ণি তৈরী করিয়া এদিক হইতে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। আর বুড়ারা কর্ম্মকর্ত্তার মতো হুঁকা হাতে চারি ধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

—ওহে ও কম্মকার, এক ধার থেকে পাঁক তোলো। এখানে একখাবল, ওখানে একখাবল ক'রে নিলে তো হবে না। ওই তোমার বাঁ দিকে সা'জি কি রকম ক'রে পাঁক তুলছে দেখ। ওই রকম ক'রে। হ্যাঁ।

—আরে, এই ছেলেগুলো কাদের হে? অশাঁপা ছেলে! ভেঁপু বাজিয়ে বাজিয়ে কান জ্বালিয়ে তুললে!

ছেলেগুলির মজা বাড়িয়া যায়। আর যত পারে ভেঁপু বাজায়।

—লে বাবা! ঘাড়ের উপর পড়বি নাকি? দেখে চলতে জানো না?

একটা ছেলে তালপাতার ঘুর্ণি লইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল। ছেলেটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

মেলা বলিলেই হয়। কেবল কয়েকখানি দোকানের অভাব।

পূর্ব্বদিকটাই নিরিবিলি। সেদিকের একটা গাছের ছায়ায় নিত্যরূপদের আড্ডা বসিত। এই দলটির সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য সকলের আচারে ব্যবহারে সকল দিকেই একটা বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে ইহারা যখন ঘোরাফেরা করে, মনে হয় ইহারা যেন

এখানকার মাটির নয়। অন্যান্য ছেলেরাও বড় একটা ইহাদের সঙ্গে মেশে না।

গাড়ীতে গাড়ীতে রাশি রাশি পাঁক উঠিতেছিল। মাখনের মতো কোমল পাঁক। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। বিষ্ণুরথ আপন মনেই আঙুল বাড়াইয়া এক একবার তাহার স্পর্শ লইতেছিল। স্নিগ্ধ স্পর্শ।

—ও কি করছ?—নিত্যরূপ জিজ্ঞাসা করিল।

বিষ্ণুরথ অপ্রস্তুতের মতো হাসিয়া কহিল, বেশ লাগছে। কোমল এবং স্নিগ্ধ। আমার ভারি লোভ হচ্ছে, ওদের মতো পাঁক ঘাটি।

বিষ্ণুরথ আর একবার হাসিল।

৪

আষাঢ়ে বিষ্ণুরথের বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সে ডিষ্টিংশানে পাস করিয়াছে। অতঃপর কি করিবে সেই সম্বন্ধে নিত্যরূপের সঙ্গে কথা হইতেছিল। নিত্যরূপ আইনের উপর খড়্গহস্ত।

বলিল, ল' নিও না। এম,এ,-টাই বেশ ভাল ক'রে পাস কর।

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, আমি তো আপনার মতো ভালো ছেলে নই যে, ফার্স্টক্লাস পাবার সম্ভাবনা আছে। প্রাণপণে খাটলে বড় জোর একটা সেকেণ্ড ক্লাস পেলেও পেতে পারি। তাতে তো প্রোফেসারি জুটবে না। আমাকে শামলা চড়িয়ে গাছতলায় ঘোরাঘুরি করতে হবে।

—বল কি !—নিত্যরূপ হাসিয়া উঠিল,—তোমার জীবনে ও দুর্ভোগ আর পোয়াতে হবে না।

—জীবিকার জন্যে পরিশ্রম করা কি দুর্ভোগ ?

—দুর্ভোগ বই কি ! পরিশ্রম করাই একটা দুর্ভোগ ! পেটের জন্যে পরিশ্রম করা আরও বড় দুর্ভোগ। অনেক গ্লানিই সইতে হয়। বাবাকে দেখিছি, এক একদিন কারও সঙ্গে কথা কইতেন না। হয়তো প্রিন্‌সিপালের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হ'য়েছে। কিছুতে তিনি প্রিন্‌সিপালের মত মেনে নিতে রাজি নন। কিন্তু পরে শুধু আমাদেরই মুখ চেয়ে নিজের বিবেক, নিজের বুদ্ধি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সেই বিরুদ্ধ মতই মেনে নিতে হ'য়েছে। এ গ্লানি কি কম ?

—সেই জন্যেই ভাবছি ওকালতি করব,—স্বাধীন ব্যবসা।

নিত্যরূপ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—আমিও তাই ভাবতাম আগে। কিন্তু সেবার এলাহাবাদ গিয়ে চক্ষুস্থির হয়েছে। আমার মামাতো দাদা বলেন্দ্রবাবুকে তো জান ? এলাহাবাদে প্র্যাক্‌টিস্ করেন। হাজার দুই কামান। মেজ বৌদি প্রায়ই শামলায় আগুন ধরিয়ে দেবেন ব'লে শাসান। বলেন, দুজনে ক্কচিৎ কখনও দেখা হয়। মেজদা সকাল ছ'টায় নীচে নামেন। কাজ সারতে দশটা। তখন দু'টো নাকে-মুখে দিয়ে কাছারী বেরোন ফেরবার সময় হেঁটে ফেরেন। ওটা এক্সারসাইজ। তারপরে হাত-মুখ ধুয়ে আবার নীচের আফিস ঘরে বসেন। উঠতে কোনো দিন বারোটা, কোনো দিন একটা। তবু তো এখন আর সিনিয়রের বাড়ীর বাজার করতে হয় না।

নিত্যরূপ হাসিল।

—কিন্তু আমি বলছি, তোমার তাই বা করবার দরকার কি ? তবে আইনটা পড়া থাকাই ভালো। জমিদারী চালানর সুবিধা হবে।

বিষ্ণুরথ অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য অ[illegible] করিল।

কহিল, জমিদারী আমি কোনো দিনই চালাব না নিত্যদা; আপনি বাইরে থেকে ওর কতটুকুই বা দেখেছেন? ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আসে অন্ধতা। মানুষকে আর চোখ মেলতে দেয় না। অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে আসে যথেচ্ছাচার। তার আর শেষ নেই। ওর ওপর আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমি জমিদারী চাই নে নিত্যদা। তার চেয়ে খেটে খেতে চাই।

এক একজন কথা বলে, যার মধ্যে যথেষ্ট ভাবালুতা থাকিলেও কোথাও কৃত্রিমতা নাই। নিত্যরূপ ভাবপ্রবণ ছেলেটির প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

বিষ্ণুরথ কহিতে লাগিল, আমার সমস্ত জমিদারী আমি দেবোত্তর করব। তার আয়ের একটি কণাও আমি নিজে গ্রহণ করব না। সমস্ত জনহিতকর কাজে ব্যয়িত হবে। সমস্ত সম্পত্তি [illegible]বারণের সম্পত্তি হবে, আমি মাত্র সেবাইত হয়ে থাকব। আমার জীবি[illegible] নিজেই অর্জ্জন করব।

ভাবের আবেগে নিত্যরূপ বিষ্ণুরথকে বুকে জ[illegible]য়া ধরিল। আনন্দে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। কহিল

—বিষ্টু ভাই, সকল মানুষের সমান অধিকার এ আমার কাছে নিশ্বাসের মতো সত্য। এই সত্য আমি আমার বাক্যে ও আচরণে প্রতিনিয়ত প্রচার করেছি। কিন্তু যখনই ভাবি এর জন্যে কি মূল্য আমি দিলাম তখনই আমার বাক্য দুর্ব্বল হয়, আচরণ মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। এতদিনে তোমার জীবনে এই সত্য জীবন পেলে। তোমার যথাসর্ব্বস্বের মূল্যে এই সত্য সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠবে।

নিত্যরূপ পরম স্নেহে বিষ্ণুরথের গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, আমি

বয়সে তোমার বড়। সেই অধিকারে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ব্রত সফল হোক।

বিষ্ণুরথের জীবনে এই মুহূর্ত্তে হঠাৎ যেন একটা কি হইয়া গেল। সার্থকতার আনন্দে একটা স্ফুলিঙ্গ, কিম্বা অমনি একটা কিছু, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঢিপ্ করিয়া নিত্যরূপের পায়ে মাথা ঠেকাইল।

বিষ্ণুরথের পড়িবার ঘরের উত্তরের জানালা খুলিয়া দিলেই সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী মাঠ। কচি কচি ধান গাছে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে খালের জল রূপার চন্দ্রহারের মতো ধরণীর নিতম্ব বেড়িয়ে চিক্ চিক্ করিতেছে। পুকুরের পাড়ে-পাড়ে এক-আধটা নিঃসঙ্গ গাছ যেন নগ্ন দেহে দাঁড়াইয়া চুল ঝাড়িতেছে। সম্মুখে একখানা বাংলা কবিতার বই খুলিয়া রাখিয়া বিষ্ণুরথ সেই দিকেই চাহিয়া ছিল।

অকস্মাৎ দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল কাজলী। কাজলী নয়, যেন এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস বেণুবনে বাজিয়া উঠিল :

—পাশ তো করলে, আমাদের খাওয়াচ্ছ কবে বল

বিষ্ণুরথ যেন নিজের চোখ-কানকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। কাজলী! সে আসিয়াছে তাহার ঘরে! একা! বিষ্ণুরথকে সে যেমন চেনে এমন আর কে চেনে? তবু?

কাজলী একেবারে তাহার টেবিলের কাছে সরিয়া আসিল। ঠোঁটে বাঁকা হাসি টানিয়া বলিল, বল?

কথাটা যেন বিষ্ণুরথকে একটা ধাক্কা দিয়া সচেতন করিল। সে শুষ্ক মুখে কহিল, কি বলব?

—পাশ যে করলে, খাওয়াতে হবে না ?

—হবেই তো।

—সে কবে ?

—বলি।—বলিয়া বিষ্ণুরথ হঠাৎ বাঘের মতো লাফ দিয়া দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুই হাত দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। চোখ তাহার দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছিল। সেবারে একটা সুযোগ হেলায় ছাড়িয়া কী গ্লানিই না সঞ্চয় করিয়াছে !

রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল, এবার ?

কাজলীর ভয় হইয়াছিল কি না ভগবান জানেন। সে কিন্তু ছোট মেয়ের মতো খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কহিল, এবার কি ?

তেতলার প্রান্তে এই ঘরখানি অন্য ঘর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। না ডাকিলে এদিকে বড় একটা কেহ আসেও না। তার উপর সিঁড়ির মুখে সেকালের চাপা-কপাট। চেঁচাইয়া মরিয়া গেলেও কেহ শুনিতে পাইবে না।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিষ্ণুরথ সেকথা একটু ভাবিল। সম্মুখের দেওয়ালের বড় ঘড়িটার বড় কাঁটা একটা মিনিটের ঘর হইতে আর একটা মিনিটের ঘরে টক্ করিয়া লাফাইয়া গেল! বিষ্ণুরথ দরজাটা খুলিয়া দিয়া বলিল, যাও।

কিন্তু কাজলী যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখাইল না। কেবল যে তাহাকে ভালো জানে, সে বুঝিবে ভিতরে-ভিতরে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে।

বলিল, জান বিষ্টুদা, আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে।

—কোথায় ?—বিষ্ণুরথ কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া চেয়ারের পিছনটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

—কোথায় তা কি আমি জানি? শুনেছি, অ্যানথ্রপলজিতে না কিসে গেলবার ফার্স্টক্লাস পেয়েছে। আচ্ছা, অ্যানথ্রপলজি তো নৃ-তত্ত্ব। ও প'ড়ে কি শেখে ?

অন্যমনস্কভাবে বিষ্ণুরথ কহিল, মরা মানুষের ঠিকুজি তৈরী করে।

—ওমা, সে আবার কি!—কাজলী উচ্চকণ্ঠে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনই গম্ভীর হইয়া বলিল, তা হোক। দেখতে শুনেছি নাকি রাজপুত্রের মতো।

বলিয়া বিষ্ণুরথের আপাদমস্তক এমন ভাবে দেখিতে লাগিল যে, সে পর্য্যন্ত হাসিয়া ফেলিল।

—কি দেখছ ? আমার চেহারা সে তুলনায় কত খারাপ, তাই ?

কাজলীও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, আমি আবার দেখব কি ? আমি কি জানি না ? তোমাকেই দেখাচ্ছিলাম।

বিষ্ণুরথ মাথা নাড়িয়া বলিল, আমাকেই বা দেখাবে কি ? আমার কি চোখ নেই ? না, আয়নায় মুখ দেখি না ?

—দেখ ? তবু ভালো। আমার ধারণা ছিল, তুমি বুঝি নিজেকে খুব সুপুরুষ ভাব।

বিষ্ণু হাসিয়া কহিল, না নিজের সম্বন্ধে আমি কিছুই ভাবি না। সুপুরুষও না, কুপুরুষও না,—বিদ্বানও না, মূর্খও না,—বড়লোকও না, গরীবও না। কিন্তু তোমাকে জিগ্যেস করছি, তুমি সুপুরুষ নইলে বুঝি বিয়ে করবে না ?

কথাটার মধ্যে কোথাও বোধ করি হুল ছিল। কাজলীর বুকের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

নিজেকে সামলাইতে সে একটু সময় লইল। পরে গম্ভীরভাবে কহিল, তোমার সঙ্গে এ সব আলোচনা করতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি নিজের মান নিজে খুইয়েছ। তোমাকে কোনো মেয়েই লজ্জা করবে না।

—তা না করুক। তুমি আমার কথার জবাব দাও।

—দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বল তো, তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে কি জান?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসিয়া বিষ্ণুরথ কহিল, কিছুই জানি না। কোনো পুরুষই তোমাদের সম্বন্ধে কিছু জানে না।

—তবে তোমারও জেনে কাজ নেই। পথ ছাড়। নীচে মা এসেছেন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

বিষ্ণুরথের চোখ আর একবার হিংস্র প্রাণীর মতো চক্ চক্ করিয়া উঠিল। অন্যমনস্কভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল, তাই নাকি?....তবে তো তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে...আরও আগে যাওয়া উচিত ছিল...তিনি আবার কত কি ভাবতে পারেন.... আশ্চর্য্য নয়....

বলিতে বলিতে হঠাৎ সুমুখের চেয়ারটা বাঁ দিকে সরাইয়া দিয়া কাজলীকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। কাজলী একবার প্রাণপণ বলে তাহাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিষ্ণুরথের লৌহপেশীর পেষণে সকল চেষ্টা ভাসিয়া গেল। বুকের মধ্যে নির্দ্দয়ভাবে চাপিয়া পিষিয়া, এবং ওষ্ঠে, কপোলে, চোখে, ললাটে চুম্বনের পর চুম্বন দিয়া যখন তাহাকে বিষ্ণুরথ ছাড়িয়া দিল তখন তাহার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ভয় হইল, পা যেরূপ টলিতেছে

তাহাতে এখনই হয়তো পড়িয়া যাইবে। কাজলী টেবিলের প্রান্তটা শক্ত মুঠায় চাপিয়া ধরিল। একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, বিষ্ণুরথ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। চোখে সে হিংস্রতা নাই, নূতন মেঘের মতো স্নিগ্ধ। কাজলী চোখ নামাইয়া লইল। তাহার মনে হইতেছিল, বিষ্ণুরথের বুকের মধ্যে যেন একটা যুগ কাটিয়া গেল। একটি মেয়ের সমস্ত যৌবন। যেন বহুকাল।

বস্ত্র সম্বরণ করিয়া কাজলী আর একবার নিষ্প্রভ চোখ তুলিয়া চাহিল। সে তখনও তেমনই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া একই ভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—সর।

বিষ্ণুরথ সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কাজলী একেবারে তাহার গা ঘেঁসিয়া বাহির হইয়া গেল। বিষ্ণুরথ আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকুও দ্বারের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। একবারও চাহিয়া দেখিয়া গেল না, যে বর্ব্বরের মতো এই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিল তাহার অবস্থা কি হইয়াছে।

বিষ্ণুরথ চেয়ারে বসিয়া এলাইয়া পড়িল। তাহার শরীরের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিলে মনে হয়, সে বুঝি এখনই হিমালয় অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিল।

চাকর আসিয়া চা ও খাবার দিয়া গেল। খাবার ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া সে শুধু এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

শ্রান্তিতে অবসাদে ও কি এক প্রকার অজানিত আশঙ্কায় সমস্ত ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য চিন্তা করিয়া দেখিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

যে সকল ঘটনার সংঘাতে মানুষের জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া ওঠে তাহা প্রায়ই এমনি অকস্মাৎ আসে। মানুষকে ভাবিবার সময় দেয় না। বুদ্ধি দিয়া বিচার করিবার অবসর দেয় না। এমন কি মানুষের সহজাত সংস্কার এবং বিবেককে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আধ ঘণ্টা আগেও সে কবিতার বই পড়িতেছিল। সম্মুখের অবারিত মাঠের মধ্যে মন নিজেকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করিয়া দিতেছিল। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব একটি সুস্নিগ্ধ মধুর রসে টুল্ টুল্ করিতেছিল। অকস্মাৎ আসিল জোয়ার। বিপুল প্লাবনে দুই তটের চিহ্নমাত্র রহিল না। সমস্ত অবলুপ্ত হইয়া গেল। বিস্বাদ লোণা জলে এখনও তাহার গা রি-রি করিতেছে।

আপনার সংযমের উপর বরাবর তাহার অত্যন্ত বেশী বিশ্বাস ছিল। রামকৃষ্ণদেবের সমস্ত বাণী তাহার কণ্ঠস্থ। বিবেকানন্দ কোথায় কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা সে অতি যত্নসহকারে পড়িয়াছে। নিত্যরূপের শিষ্য, দেশসেবায় নিবেদিতপ্রাণ। আপনার দেহ, মন ও আত্মাকে পবিত্র রাখিবার জন্য এতদিন ধরিয়া কী কঠোর সাধনাই না করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ কী! একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর উপস্থিতি তাহার এতদিনের সমস্ত সাধনাকে কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া গেল! এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়!

মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওকি রে! খাবার খেলি না?

—শরীরটা ভালো নেই মা।

ওপাড়ায় বসন্ত হইতেছে। ক'টা মারাও গিয়াছে। সন্ধ্যা বেলা

নাকি জ্বর হয়, সকালে সমস্ত দেহ গুটিতে ভরিয়া যায়। তিল রাখিবার জায়গা থাকে না। সৌদামিনী ঝি নিজে বলিয়াছে।

মা উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, সে আবার কি? জ্বর হয় নি তো?

পুত্রের ললাট স্পর্শ করিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে! এ যে বেশ জ্বর হয়েছে!

জ্বর! তাই বটে! বিষ্ণুরথের মনে হইল, এ যেন পরীক্ষা পাশের পর জলপানির সংবাদ আসিল। জ্বরই হইয়াছে। নহিলে এত বড় বর্ব্বরতা কি সে করিতে পারে? জ্বরের ধমকেই হওয়া সম্ভব।

ক্লান্ত স্বরে বলিল, আমার খুবই জ্বর হয়েছে মা। বিছানাটা পেতে দিতে বল তো। আর ব'সে থাকতে পারছি না।

নিজেই পুত্রের শয্যা প্রস্তুত করিতে করিতে মা বলিলেন, এতখানি জ্বর হ'য়েছে, চুপ ক'রে ব'সে আছিস! আমাকে একটা খবর দিতে নেই?

অন্যমনস্কভাবে বিষ্ণুরথ বলিল, মনে ছিল না মা।

মা বিষ্ণুরথকে বুকে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন; এবং ঝি, চাকর-বাকরদের ডাকিয়া এমন একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করিলেন, যাহা পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালী মায়েই পারে। একজনকে পাঠাইলেন বাবুকে ডাকিতে। সে আসিয়া জানাইল, বাবু আসছেন।

—আসছেন নয়, বল্ এক্ষুনি আসতে। খোকাবাবুর খুব জ্বর তা ব'লেছিস?

—ব'লেছি মা।

—ছাই বলেছিস্। যা গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, আমার সঙ্গে আসুন।

আর একজন গেল, ডাক্তার ডাকিতে।

পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল কোথায় নাকি একজন বড় ডাক্তারের কাছে কম্পাউণ্ডারী করিয়াছিলেন। কিছু কাল হইতে এই গ্রামেই আসিয়া প্রাক্‌টিস্ করিতেছেন। কিন্তু লোকটির অদৃষ্ট ভালো। এই দশ-বারো বৎসরের মধ্যেই জমি-জায়গা কিনিয়া এইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ডাকও যথেষ্ট। সকালে কোনো দিন পান্তাভাত, কোনো দিন বা মুড়ির সঙ্গে এক বাটি চা খাইয়া ধুতি-পাঞ্জাবীর উপর একটা হ্যাট চড়াইয়া ঘোড়ায় বাহির হন। চারটের আগে আর ফেরেন না। তার উপর এখন আবার তাড়ির সময়। প্রায়ই কোনো না কোনো রোগীর বাড়ী বসিয়া যান, রাত্রি আটটা নয়টার আগে আর ফিরিতে পারেন না।

যে চাকর তাঁহার খোঁজে গিয়াছিল সে আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তারবাবু এখনও ফেরেন নাই। এখন 'রসের সময়', কখন যে ফিরিবেন কেহই বলিতে পারিল না।

মা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

—তাহ'লে? তুই এক কাজ কর বাবা। ঘোড়াটা নিয়ে যা। যেখানে পাবি সেখান থেকে তাকে ধ'রে নিয়ে আসবি। বুঝলি?

বুঝিল বটে, কিন্তু ডাক্তারকে ধরিয়া আনিবার অর্থ যে কি তাহা ভাবিয়া তাহার মন খুব প্রসন্ন হইল না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব অথবা পশ্চিম কোন্ দিকে যে তিনি গিয়াছেন কেহ জানে না। হয়তো পাশের গ্রামে গিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। আবার হয়তো দশখানা গ্রাম ঘুরিয়াও নাগাল পাওয়া যাইবে না। তবু যাইতে হইল।

—একবার থার্ম্মোমিটারটা দাও তো মা।

একশ্‌শো-দুই তাপ। ক্রমেই বাড়িতেছে। চোখ রক্তাভ।

—চারিদিক খুব বসন্ত হচ্ছে, না মা? গায়ে হাতে বেদনাও আছে।
—অস্ফুট স্বরে বিষ্ণুরথ কহিল,—কি জানি কি হবে!

মা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ওকথা বলিস না, বাবা।

হাতের এক পাটি অনন্ত খুলিয়া একবার পুত্রের কপালে একবার নিজের কপালে ঠেকাইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া রাখিলেন মা শীতলার উদ্দেশে। আরও কি মানৎ করিলেন তাহা আর কেহ জানিল না।

ত্রৈলোক্যবাবু শুষ্কমুখে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

—জ্বর কি খুব বেশী?

মা ছেলের মাথার দিকে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। যেমন পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন তেমনি রহিলেন। সাড়া দিলেন না।

ত্রৈলোক্যবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, ডাক্তারের কাছে কে গেল রে!

বাহিরে কেহই ছিল না। সে দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না। ত্রৈলোক্যবাবু শয্যার কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

৫

পরদিন সকাল বেলা নিত্যরূপ বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বিষ্ণুরথের বসন্ত হইয়াছে।

নিত্যরূপের মা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, সে কিরে? এই যে কাল দেখে এলাম....

নিত্যরূপ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, কাল বিকালেই হঠাৎ জ্বর আসে। রাত্রে একশো চার পর্য্যন্ত উঠেছিল। সকালে সর্ব্বাঙ্গে গুটি বেরিয়েছে। দেখে আর চেনবার উপায় নেই।

—বাছারে!

ঘরের মধ্যে কাজলী তরকারী কুটিতেছিল। নিঃশব্দে আসিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল।

—কাকীমা পূজোর ঘরে খিল বন্ধ করেছেন। কাকাবাবু রোগীর বিছানার পাশে শুনলাম কাল বিকেলে সেই যে ব'সেছেন আর ওঠেন নি। কেমন যেন জবু থবু হ'য়ে পড়েছেন। যাঁর ভয়ে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়, তাঁর মুখ দেখে আজ কষ্ট হচ্ছে। মানুষ কী অসহায়!

নিত্যরূপ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

—বিষ্ণু মশারী ঢাকা দিয়ে প'ড়ে আছে। কারও ডাকেই মুখ বার করছে না। আমার সাড়া পেয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে। ওর বোধ করি ভয় হয়েছে।

নিত্যরূপের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে, ডাক্তার দেখে কি বলেছে?

—ডাক্তার তো একজন নয় মা। এরই মধ্যে শহর থেকে এসেছেন

দু'জন ডাক্তার! তাঁদের দু'রকম মত। আচার্য্য বামুন এসেছেন জন চারেক। তাঁদেরও একজনের সঙ্গে আর একজনের চিকিৎসার মিল নেই। এর ওপর দেখলাম ঠাকুরবাড়ীতে দু'জন সন্ন্যাসী এসে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন। তাঁরাও কি সব যাগযজ্ঞ করবেন।

—তুই নিজে তো দেখে এলি? কেমন দেখলি?

—কই আর দেখে এলাম মা? ও তো কাউকে মশারী তুলতে দিচ্ছে না। বার বার বলতে মশারীর ফাঁক দিয়ে একখানা হাত বার ক'রে দিলে। মনে তো হ'ল ভালোই বেরিয়েছে।

নিত্যরূপের মা সহানুভূতির সঙ্গে বলিলেন, আহা! সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, ওই একটি মাত্র ছেলে! মা শীতলা শিগ্‌গির আরাম ক'রে দিন, তবে না?

নিত্যরূপ পূর্ব্বের কথার সূত্র টানিয়া বলিতে লাগিল, ছোট ছেলে তো নয়। জানে এ রোগের শুশ্রূষাও নেই, সত্যিকার কোনো চিকিৎসাও নেই। তাই ঘরের মধ্যে কাউকে থাকতে দিচ্ছে না।

—হ্যাঁরে, তা ভয় নেই তো?

—ভয়? অত বড় মন, অমন ভালো ছেলে, বৃদ্ধ বাপ-মার একমাত্র সন্তান,—ভয় আর নেই? ও যে কত বড় মন নিয়ে এসেছে মা, আর কত যে বড় বড় সঙ্কল্প ওর মাথার ভেতর আছে সে শুধু আমি জানি। তাই আমার কেবলই ভয় হচ্ছে, ও বুঝি বাঁচবে না।

নিত্যরূপের মা রান্না ঘরে ডাল চড়াইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার আর বসিবার উপায় ছিল না। চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, ভয় পাচ্ছিস কেন? ভালো হ'য়ে যাবে বই কি! বসন্ত কি আর সারে না?

নিত্যরূপ শুধু ম্লানভাবে একবার হাসিল।

এতক্ষণ পরে কাজলী কথা কহিল। বলিল, তুমি আবার কখন দেখতে যাবে দাদা?

—দেখতে যাওয়ার তো কোনো মানে নেই কাজলী। মানুষের সাধ্য নেই ওর এতটুকু যন্ত্রণার লাঘব করে। তবু যাই, যেতে হয় তাই যাই। কিন্তু কী অসীম ওর ধৈর্য্য কাজলী,—এত যন্ত্রণা, তবু এতটুকু সাড়া নেই।

কাজলী তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কখন যাবে?

—কেন? তুই যাবি?

—যেতাম।

—বেশ তো। যাস না কেন? আমি কখন যাব তার কি ঠিক আছে? বরং মায়ের সঙ্গে যাস।

কাজলী মাথা নাড়িয়া বলিল, তোমার সঙ্গেই যাব দাদা। মায়ের কখন সময় হবে, না হবে....

নিত্যরূপের কোথাও এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে ভালো লাগিতেছে না। মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তাই যাস। আমি বিকেলে যখন যাব, তোকে ডেকে নিয়ে যাব।

নিত্যরূপ উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিষ্ণুরথ পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। গুটিতে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী,—গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে। মৃত্যুর ভয় তাহার ছিল না। সে কথাটা মনে উদয়ও হয় নাই। কেবল যতগুলি বসন্ত রোগীর বীভৎস মুখ সে দেখিয়াছে

তাদেরই মুখ বার বার মনে পড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে নিজের কথা ভাবিয়া সে কেবলই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাজলীর স্বামী আসিবে। রাজপুত্রের মতো অপরূপ তাহার কান্তি। বাঁচিয়া থাকিলে একদিন না একদিন এই বীভৎস মুখ তাহার চারু মুখকান্তির পাশে দাঁড় করাইতে হইবে। গত দিনের মতো সেদিনও নিশ্চয় কাজলী উভয়ের মুখের পানে যথাক্রমে চাহিয়া মনে মনে হাসিবে। বিষ্ণুরথের মনে হইল সেদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

মাঝে মাঝে হাসিও আসে। এতটা বয়স হইল, ইতিপূর্ব্বে কোনো দিন নিজের রূপের দৈন্য লইয়া লজ্জা অনুভব করে নাই। কোনো পুরুষই করে না। এ ব্যাধি মেয়েদেরই একচেটিয়া। আজ এ তাহার কী হইল! কেনই বা এত কাঙালপনা! কাজলী অসাধারণ মেয়ে কিছু নয় যে, তাহার জন্য কবিত্ব করিয়া দেহপাত করিতে হইবে। সংসারে তাহার নিজেরও আর্থিক মূল্য কম নয়। আজ ইচ্ছা করিলে কাল সে এমন মেয়ে ঘরে আনিতে পারে যাহার পায়ের নখের কাছে দাঁড়াইতে গেলেও কাজলী লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিবে। বিষ্ণুরথ আপন মনেই হাসে: তাহার মতিভ্রম হইয়াছে।

অথচ মুস্কিল এই যে, কাজলীকে লইয়া কিছুতেই সে জমা খরচের হিসাবও করিতে পারে না। কাজলীর অনেক জিনিস আছে এবং অনেক জিনিস নাই। কিন্তু কি আছে আর কি নাই তাহার হিসাব নিকাশ কোনো দিন করিয়া দেখে নাই। কখনও মনে হয়, সে বুঝি কতকগুলি কথার সমষ্টি। কবে কোন দিন কি কথা বলিয়াছিল আপন মনে তাহাই রোমন্থন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়। কখনও মনে হয় সে বুঝি কতকগুলি রেখার সমষ্টি। কবে কেমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাসিলে

কোন রেখাটি কি মধুর ভঙ্গিতে ফুটিয়া ওঠে, ক্রুদ্ধ হইলে কেমন করিয়া ভ্রূকুটি হানে মাঝে মাঝে তাহাই ভাবে।

কিন্তু সেদিনের ঘটনার পরে তাহার সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। সেদিনের ঘটনা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ করিতে পারে না। কিছু মনে পড়ে, কিছু পড়ে না। যাহা মনে পড়ে তাহাও অস্পষ্ট এবং ছাড়া-ছাড়া। কোনো পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। যেন স্বপ্নে দেখা। এমন ঘটনা যে সত্যই ঘটিয়াছিল মাঝে মাঝে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। পীড়িত অবস্থায় এ সব সম্বন্ধে বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে গেলে ক্লান্তি আসে।

—বিষ্টু!

বিষ্ণুরথ শুনিতে পাইল। কিন্তু সাড়া দিল না, মুখও ফিরাইল না। তাহার মনে হইতেছিল, স্বপ্ন। আর এক ডাকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

—বিষ্টু!

স্বপ্ন নয়। কিন্তু তাহার পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ওই পাশেই শুইয়া ছিল। বাঁ দিকটা ব্যথা করিতেছে।

বিষ্ণুরথ চোখ না মেলিয়াই ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, নিত্যদা? বসুন। ভালোই আছি আজকে।

—শরীরে যন্ত্রণা নেই?

—শরীরে? আছে একটু। সামান্য।

—কি খেলে?

—আমি? কি জানি! কি তো খাইয়ে গেল এখুনি।

বিষ্ণুরথ অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া পাশ ফিরিল। সম্মুখেই নিত্যরূপ। একা নয়। পাশে কাজলী কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া আছে। চোখে পলক পড়িতেছে না। সে দৃষ্টিতে কি ছিল বলা কঠিন। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার বুকের ভিতর হইতে

আরামের নিশ্বাস পড়িল। কেমন যেন মনে হইল, কাজলী নিশ্চয়ই সেদিনের বর্ব্বরতার কথা কাহাকেও বলে নাই।

নিত্যরূপ পাশের চেয়ারে বসিয়া বলিল, শীগ্‌গীরই ভালো হয়ে যাবে। সবাই বলেছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন জায়গায় তাহার বিছানাটা পাতা ছিল যে মশারির ভিতর দিয়া তাহাকে আবছা দেখা যাইতেছিল। ঠিক বোঝা গেল না নিত্যরূপের কথা সে শুনিতে পাইল কি না।

নিত্যরূপ বলিতে লাগিল, তোমার ভর্ত্তির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ফর্ম্ পাঠাতে স্থকুমারকে লিখেছি। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে এসে পড়বে। এখান থেকে ফর্ম্ পূরণ করে টাকা পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কি বিষয় নেবে বল তো?

এবারও বিষ্ণুরথের তরফ হইতে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু সে যে ঘুমায় নাই তাহা তাহার নিশ্বাসের শব্দে বোঝা যাইতেছিল।

নিত্যরূপ আবার কহিল, তোমার জন্যে আমাদের কত কাজ যে আটকে রয়েছে জান তো? ছুটি শেষ হ'তে চলল। যাওয়ার আগে নাইট্ স্কুলের ব্যবস্থা ক'রে যেতে হবে। নইলে ফিরে এসে শুনব, আমরাও চলে গেছি, স্কুলও উঠে গেছে।

নিত্যরূপ গেলবারের কথা স্মরণ করিয়া হাসিল।

—কিছু টাকারও ব্যবস্থা করতে হবে। চাঁদা একটি পয়সাও উঠবে না। দীঘি সংস্কারে সবাই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। আর একটি পয়সাও কেউ দেবে না। যা হয় আমাদের নিজেদের মধ্যেই তুলতে হবে।

নিত্যরূপ বিষ্ণুরথের উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তারপর কহিল, ওরা কেউ এসেছিল বিকেলে?

এতক্ষণ পরে বিষ্ণুরথ উত্তর দিল। কহিল, এসেছিল। কিন্তু আমি আর আসতে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। কেন যে আপনারা আসেন জানি না। শুধু শুধু বিপদ ঘাড়ে নেওয়া।

—তাই ব'লে তোমাকে দেখতে আসব না?

—না। চক্ষু লজ্জার খাতিরেই হোক আর বন্ধুতার টানেই হোক যারা আসে তারা মিথ্যে আসে।

কাহারও দেখিতে আসা বিষ্ণুরথ যে পছন্দ করে না তাহা নিত্যরূপ জানিত। তাই আর অনর্থক কথা না বাড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল।

একটু থামিয়া বিষ্ণুরথ আবার কহিল, তা ছাড়া এ রোগ বড় খারাপ রোগ। জীবন্‌-মৃত্যুর কথা ভেবে বলছি না। ভগবানের দেওয়া রূপ লাবণ্য একেবারে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দেয়। ভারি খারাপ রোগ।

ইহার পরে আর কেহ কোনো কথা কহিল না। শব্দহীন কক্ষে শুধু দেওয়ালের বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতে লাগিল।

এমনি অনেকক্ষণ কাটিল। হয়তো আরও বহুক্ষণ কাটিত। কিন্তু কাজলী দাদাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, চল দাদা।

—হ্যাঁ যাই। আজকে উঠলাম বিষ্টু।

দুজনে চলিয়া গেল। বিষ্ণুরথ ভদ্রতাবাচক একটা কথাও বলিল না, ধীরে ধীরে আবার ওপাশ ফিরিয়া শুইতেই দু'ফোঁটা অশ্রু উপাধানের উপর গড়াইয়া পড়িল।

দিন কয়েকের মধ্যেই বিষ্ণুরথ অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। ঘা অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে। শরীরের গ্লানিও কমিয়াছে। কিন্তু বড় দুর্ব্বল। গদীর উপর বেশ পুরু করিয়া নিমপাতা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার দুইজন আগেই বিদায় লইয়াছেন। তাঁহাদের আর ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। আচার্য্য দুইজনকে তখনও ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদেরও গৃহকর্ম্ম আছে। অকারণে আর বেশী দিন অপেক্ষা করিবার তাঁহাদের শক্তি নাই। শীঘ্রই আবার আসিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহারা বহুকষ্টে বিদায় লইলেন। কেবল সন্ন্যাসী দুই জনের গৃহও নাই, গৃহকর্ম্মও নাই। তাঁহারা ধুনী জ্বালিয়া রহিলেন। অন্দর হইতে তাঁহাদের আহার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ আটা ও ঘৃতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গৃহিণী স্বয়ং তাঁহাদের পরিচর্য্যায় মন দিয়াছেন। বিষ্ণুরথ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হইলে তাঁহাদের দ্বিতীয় আশ্রয় দেখিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিষ্ণুরথ এখনও মশারির বাহিরে আসে না। কেহ কোথাও না থাকিলে মশারি তুলিয়া শম্বুকের মতো অতি সন্তর্পণে মুখ বাহির করে। সম্মুখেই একটা আলমারী আছে। তাহার আয়নায় মুখ দেখিবার চেষ্টা করে। ভালো করিয়া নজর চলে না। কিন্তু যেটুকু দেখা যায় তাহাতেই সে শিহরিয়া ওঠে। মানুষের মুখকে এমন বীভৎস করিবার মতো রোগও আছে! তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে। ইহার চেয়ে যে মৃত্যুও ছিল ভালো! এমন কুৎসিৎ মুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতা কি?

হঠাৎ বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ পাইয়া বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি মুখ ঢুকাইয়া লইল।

ত্রৈলোক্যবাবু টিপিয়া টিপিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। একদৃষ্টে পুত্রের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার তেমনি সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরেই গৃহিণী আসিলেন। মশারী তুলিয়া একটু হরির মাটি

পুত্রের ললাটে ও মুখে ঠেকাইয়া দিলেন। বিষ্ণুরথ কিছুই বলিল না। যেমন চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়া ছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। কিন্তু মায়ের চোখকে সহজেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। তিনি বেশ বুঝিলেন, ছেলে ঘুমায় নাই,—জাগিয়াই আছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, একটু কমলালেবুর রস পাঠিয়ে দিই? কি বলিস?

—এখুনি? একটু আগেই কি যেন খেলাম না?

—একটু আগে কি রে? সে তো দু'ঘণ্টা হয়ে গেল।

বিষ্ণুরথ ওপাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, তা হোক গে। এখন আর দিও না। একটু পরে দিও।

—পরে আবার দেবে? এখনি তৈরী হচ্ছে, একটুখানি খেয়ে নে। বিষ্ণুরথ চুপ করিয়া রহিল।

—হ্যাঁ, মাঁয়ার গর্ভ সার্থক হয়েছে বটে। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। অমন মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘর আলো হবে। সে পুণ্যি কে করেছে জানি না।

বিষ্ণুরথ তথাপি কোনো সাড়া না দেওয়ায় গৃহিণী বলিলেন, তুই আবার ঘুমুস নে যেন। আমি এখুনি কাজলী। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কাজলী! বিষ্ণুরথ চমকিয়া উঠিল। বলিল, কাজলী?

মা চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিমুখে বলিলেন, তবে আর বলছি কি? তোর অসুখ। আমি সেই যে ঠাকুর ঘরে দোর দিয়েছিলাম আর তো উঠিনি। উনিও কেমন যেন জবুথবু হয়ে পড়েছিলেন। মা আমার সেই যে সন্ধ্যে বেলায় এল, আর বাড়ী যায় নি। একা সাতদিক সামলেছে।

বিষ্ণুরথ বিরক্ত ভাবে বলিল, এ সব রোগে বাইরের লোককে ও রকম ক'রে ডাকতে নেই মা। ডাকা অন্যায়।

মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, শোন ছেলের কথা! আমি ওকে ডাকতে গিইছি নাকি? নিত্য সন্ধ্যেবেলায় এল। বললে, কাজলী এখানেই এ ক'দিন থাকবে কাকীমা। আমি আঁচলের চাবি ওকে দিয়ে দিলাম।

বিষ্ণুরথ আর কোনো কথা বলিল না

মা চলিয়া গেলেন। একটু পরেই একটি কাঁচের গ্লাসে করিয়া কমলা লেবুর সরবৎ লইয়া কাজলী ঘরে আসিল। বিষ্ণুরথ পিট্ পিট্ করিয়া চাহিয়া দেখিল, কাজলী একটি চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ি পড়িয়াছে। গায়ে সেমিজ, ব্লাউ কিছু নাই। মাথার এলো চুল একটা গ্রন্থি দিয়া বাঁধা। বিষ্ণু তাহাকে দেখিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল।

কাজলী গ্লাসটা টিপয়ের উপর রাখিয়া বিষ্ণুরথের পাশ ফিরিয়া শোওয়া দেখিয়া হাসিল।

কহিল, অমন ক'রে আর কতদিন মুখ লুকিয়ে বেড়াবে? মুখ কি আর কোনো দিন দেখাতে হবে না ভেবেছ?

বিষ্ণুরথ কোনো সাড়া দিল না।

কাজলী হাসিয়া বলিল, নাও ওঠ। কমলা লেবুর রসটুকু খেয়ে নাও দেখি। খুব লজ্জা হয়েছে।

—খাব এখন। ওই টিপয়ের উপর রেখে যাও।

—তাই রইল। খেও যেন।

বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

৬

আরও মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুরথ কলেজে পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার শরীরের অবস্থার জন্য মা সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন। কথা হইয়াছিল কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় বাসা করা হইবে। কিন্তু বিষ্ণুরথ মিছামিছি অত হাঙ্গামা করিতে রাজি হয় নাই। সে পূর্ব্বের মতো মেসেই থাকিবে। তবে এবারে একাই। নিত্যরূপ নাই। তাহার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ফার্স্ট ক্লাসই পাইয়াছে, তবে ফার্স্ট নয়, সেকেণ্ড। ইতিমধ্যেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া এখানে-ওখানে দরখাস্ত পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শারদীয়া পূজার আর বেশী দেরী ছিল না। ত্রৈলোক্যবাবু ভিতরে আসিয়া আহারে বসিতেই গৃহিণী পাখা হাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রৈলোক্যবাবু নিঃশব্দে আহার করিয়া চলিতেছিলেন। হঠাৎ এক সময় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুর চিঠিপত্র পেয়েছ ?

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তবু ভালো যে, আজ একবার তার কথা জিগ্যেস করলে। ধন্যি তোমার প্রাণ!

ত্রৈলোক্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, সম্মুখে আশ্বিনের কিস্তি গিন্নি, বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে। কি ক'রে যে কি হবে!

—কেন ? কেউ খাজনা দিচ্ছে না ?

—আদায় বড় ভালো হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

জমিদারী, খাজনা আদায়, এসম্বন্ধে গৃহিণী কোনো দিনই বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেন না। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এই খানেই শেষ হইল।

একটু পরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা, তা বিষ্টুর বিয়ে থা কি দেবে, না না ?

স্থানটি নিরিবিলি দেখিয়া ত্রৈলোক্যবাবু বৃদ্ধ বয়সেও একটা পরিহাস করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বলিলেন, বিলক্ষণ! ছেলে তোমার, আর বিয়ে দোব আমি? মন্দ নয়!

গৃহিণী রাগিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, খুব রসিকতা হয়েছে, থাম। আমি কিন্তু একটা কাজ ক'রে ফেলেছি। দোষ দিতে পাবে না ব'লে রাখছি।

ত্রৈলোক্যবাবু উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, দোষ না হয় নাই দিলাম, কিন্তু কাজটা কি শুনে রাখাও তো দরকার।

একটু ইতস্তত করিয়া গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, বিষ্ণুর বিয়ের যোগাড় করেছি।

—কী যোগাড় ক'রেছ ?

—কাল ও বাড়ীর দিদি এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি কাজলীকে চেয়ে রেখেছি।

বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি যেন কি চিন্তা করিতেছিলেন।

গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ইচ্ছে নেই ?

ত্রৈলোক্যবাবু টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন, ইচ্ছে নেই তা নয়। মেয়ে তো ভালোই....

গৃহিণী তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, শুধু ভালো ? অমন মেয়ে তুমি কোথায় খুঁজে পাবে শুনি ? ছেলের আমার অসুখের সময় কি সেবাটাই করলে! দেখেছ তো সব।

—তা ঠিক। গাঁয়ে-ঘরে বিয়ে ব'লেও আপত্তি করছি না। কিন্তু মেয়ে নাকি শুনছিলাম এবারে একটা পাশ দেবে?

—তোমার ছেলেও তো তিনটে পাশ দিলে।

ত্রৈলোক্যবাবু পাৎলা একটু হাসিয়া বলিলেন, তার জন্যে নয় গিন্নি। ভাবছি বৌমা এসে যখন কথায় কথায় ইংরিজি বলবেন, তখন শাশুড়ীও হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবেন, শ্বশুরও হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবেন।

—ব'ক না যাও। আমরা তো আর ওর সঙ্গে কথা বলি নি?

—বলেছ? কথায় কথায় ইংরিজি বলে না?

—তাই আবার কেউ বলে না কি?

কর্ত্তার খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তাহ'লে ভালো বলতে হবে।

গৃহিণী কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। বলিলেন, ও সব ফাঁকা কথা শুনছি না। কি তোমার মত স্পষ্ট ক'রে ব'লে যাও। শেষে যে আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলবে তা হবে না।

কর্ত্তা হাসিলেন। বলিলেন, ওই যে বললাম। ছেলে তোমার। তুমি যা ভালো বুঝবে আমি তাতে আপত্তি করব না, তোমাকে অপ্রস্তুতেও ফেলব না। তবে পাকাপাকি কিছু করার আগে ছেলের মতটা নিও। অপ্রস্তুতে যদি কেউ ফেলে ওই ফেলবে, আমি নয়।

কর্ত্তা আচমন করিয়া দুটি পান হাতে লইয়া বিশ্রামের জন্য বাহিরে গেলেন।

বিষ্ণুরথের জননীর মুখে প্রস্তাবটা শুনিয়া নিত্যরূপের জননী প্রথমে নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বিশ্বাস করিবার

কথাও নয়। মেয়ের গুণ আছে, রূপও কিছু আছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর মতো লোকের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা নাই। শুধু গুণে কি আর আজকাল মেয়ে বিকায়? শুধু তাই নয়। ত্রৈলোক্যবাবুর জমিদারী ছোট হইলেও গ্রামের মধ্যে প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, দাম্ভিকতাও তেমনি অসামান্য। তিনি যে কোনো দিন বাড়ীর পাশে নিত্যরূপদের মতো সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপনে সম্মত হইবেন এ কথাও বিশ্বাস করিবার মতো নয়। হইলেও তিনি নিজে হইতে কন্যা যাচ্ঞা করিবার পাত্র নন। অন্যলোকের কথা দূরে থাক, বিষ্ণুরথের জননীও স্বামী যে এত সহজে সম্মতি দিবেন তাহা ভাবিতে পারেন নাই। সেই জন্যই কথাটা নিত্যরূপের জননীর কাছে পাড়িবার পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে সাহস করেন নাই।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, গৃহিণী কথাটা না পাড়িলে কর্ত্তাকে নিজে হইতেই পাড়িতে হইত। বস্তুত পক্ষে, কি ভাবে কথাটা পাড়িলে সব দিক দিয়া শোভন হয়, সেই কথাই তিনি কিছুদিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। মেয়েটিকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। লেখাপড়া জানা মেয়েদের উপর তাঁহার একটা অহেতুক বিদ্বেষ ছিল। ইহাদের বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছিল না। ইহারা গৃহকর্ম্ম করে না। সন্তান পালনের দায়িত্ব আয়ার উপর ছাড়িয়া দিয়া দিবারাত্রি পুরুষমানুষের মতো হৈ হৈ করিয়া বেড়ায়। এক কথায়, স্বাধীন জেনানা বলিতে যাহা বোঝায় ইহারা তাহাই। বলা বাহুল্য. কিছুই তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। পাঁচমুখে শুনিয়া, এবং প্রাচীন লেখকদের লেখা প্রহসন পড়িয়াই এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

তারপর দেখিলেন কাজলীকে। আগামী বৎসর এই মেয়েটি একটি

পাশ দিবে। দেখিলেন তাহার রোগী সেবা। সেবায় সে কী নিষ্ঠা, সমস্ত মুখে কী অপার্থিব পবিত্রতা, কী চমৎকার নিপুণতা! কখন যে সে স্নান করিতেছে, কখন আহার করিতেছে আর কখনই বা নিদ্রা যাইতেছে জানিবার উপায় নাই। যখন যেটি প্রয়োজন, ঘড়ি-ঘণ্টা হিসাব করিয়া ঠিক তখন সেই জিনিসটি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এ যেন ইন্দ্রজাল! সকাল হইতে সকাল পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ এই মেয়েটি একা করিতেছে। নিজের হাতে। অথচ তাহার শরীরে অথবা পরিচ্ছদে কোথাও এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা নাই, চোখে কঠিন পরিশ্রমের ক্লান্তি নাই, ক্রমাগত রাত্রি জাগরণের আলস্যে গা ভাঙিয়াও আসে না। ত্রৈলোক্যবাবু যখনই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, মনে হইয়াছে এই মাত্র বুঝি সে স্নান করিয়া আসিল।

এমন আশ্চর্য্য সেবা দেখিলে সকল মানুষেরই মনে সেবাপরায়ণার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে, বিস্ময়ও জাগে। বলিতে গেলে বিষ্ণুরথ যে এ যাত্রা বাঁচিয়া উঠিল, সে শুধু এই একটি মেয়ের সেবার গুণে। সেজন্য তাহার কাছে ত্রৈলোক্যবাবু মনে-মনে কৃতজ্ঞ হইয়াও ছিলেন। কাজলীকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই মুগ্ধ হইয়াছেন। আর একটি অবিবাহিত ছেলের পাশে একটি কুমারী মেয়েকে দেখিলে যে সম্ভাবনার কথা সহজেই এবং সর্ব্বাগ্রে সকলের মনে উদয় হয় তাহা তাঁহারও মনে উদয় হইয়াছিল: ইহাদের বিবাহ হইলে বড় চমৎকার হয়।

কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবু বিষয়ী লোক। তাঁহাকে অগ্রপশ্চাৎ অনেক কিছু ভাবিতে হয়। দুজনের বিবাহ হইলে ভালো হয় সত্য, কিন্তু সে কার্য্য কি ভাবে সংঘটিত করা যায়? একে তিনি পুত্রের পিতা, তাহাতে গ্রামের জমিদার। তিনি কখনই নিজে হইতে এ প্রস্তাব তুলিতে পারেন না। অন্য কাহাকেও দিয়া কথাটা অবশ্য উত্থাপন করা যায়। কিন্তু নিত্যরূপকে

তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। সে পাঁচ জনের বাঁধা পথে চলে না, লাভ-ক্ষতির হিসাবও তাহার সাধারণের মতো নয়। সে যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে সম্মত না হয়, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।

কিন্তু সে দুর্ভাবনাও তত নয়। ত্রৈলোক্যবাবুর উপরে নিত্যরূপের যে মনোভাবই থাক না কেন, বিষ্ণুকে সে স্নেহ করে। তাহার হাতে ভগিনী সম্প্রদানে আনন্দিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাঁহার বেশী ভাবনা নিজের ছেলেকে লইয়া। তাহার মনের ভাব তিনি কিছুই অবগত নন। সে আদৌ বিবাহ করিবে কি না তাহাই তো জানা নাই। আজকালকার ছেলেদের নাকি বিবাহে আপত্তি প্রকাশ করা একটা ফ্যাশানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর বিশেষ করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে তাহার অন্য আপত্তিও থাকিতে পারে। কে জানে!

এই সকল সাত-পাঁচ ভাবিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। পুত্রের সঙ্গে সকল প্রকার সংঘাতের সম্ভাবনা তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। নিজে তিনি ভীষণ জেদী। তাঁহার দ্বারা কোনো প্রকার অঘটন ঘটাই অসম্ভব নয়। কিন্তু এ ভয়ও তাঁহার মনে ছিল যে, বিষ্ণুরথ তাঁহারই আত্মজ। জেদে সে হয়তো কম যাইবে না, এবং কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে করিবে না।

গৃহিণী ভিতরে ভিতরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া, প্রকাশ্যে স্বীকার না করিলেও, তিনি মনে মনে খুশী হইয়াছেন। কোনো দায়িত্বই তাঁহার রহিল না। কাহারও সঙ্গে সংঘাত বাধিবার সম্ভাবনাও নাই। গৃহিণীর ধৈর্য্যের উপর তাঁহার বিশ্বাস আছে। কারণ তিনি নিজে জেদী নন, এবং অপরের জেদকেও ক্ষমা করিতে পারেন।

ত্রৈলোক্যবাবু নিশ্চিন্ত মনে বাহিরের ঘরে বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

পথ চলিতে হঠাৎ রত্ন কুড়াইয়া পাইলে তাহা লুকাইবার জন্য মানুষ যেমন করিয়া ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ফেরে, নিত্যরূপের জননী তেমনি ভাবে ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিলেন।

কাজলী নীচের বারন্দায় বসিয়া প্রসাধন করিতেছিল। মাকে অমন হন্তদন্তভাবে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, কি হ'ল?

—কিছুই হয় নি।—বলিয়া মেয়ের গাল দুটি সস্নেহে টিপিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে, নিত্য কোথায়?

কাজলীর কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, বাইরের ঘরে আছে বোধ হয়। কেন? কি হয়েছে কি?

মা সহাসে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, সব কথা কি তোকে শুনতে হবে না কি? একবার শাগগির ক'রে ডেকে আন তো তাকে। বলাব বিশেষ দরকার আছে।

কাজলী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মাতা পুত্রে ক্বচিৎ কথা হয়। পুত্রের মায়ের গৃহস্থালীর বিষয়ে উৎসাহ কম। মায়েরও পুত্রের করণীয় ব্যাপারে আগ্রহ বেশী নয়।

কাজলী গিয়া বলিল, দাদা গো, মা তোমাকে ডাকছে। বিশেষ দরকার।

নিত্যরূপ কি একখানি বই পড়িতেছিল। বলিল, আমাকে? কি ব্যাপার বল্ তো?

—সব কথা কি আমাকে জানতে হবে নাকি? বললে বিশেষ দরকার। আসতে হয় এস, না আসতে হয় এস না।

নিত্যরূপ হাসিয়া বলিল, আমি জলখাবার খেয়েছি তো। বলিস নি সে কথা?

অর্থাৎ এই একটি মাত্র প্রয়োজনেই মায়ের কাছে তাহার ডাক পড়ে। তাহার আশঙ্কা হইল, মা হয়তো জল খাওয়ার কথাটা না জানিয়াই তাহাকে ডাকিয়াছেন।

কাজলী মাথা নাড়িয়া বলিল, কি জানি বাপু কেন? কোথায় তো গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বললে, তোর দাদাকে ডেকে দে, বিশেষ দরকার।

তার পরে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বোধ হয় তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছে।

নিত্যরূপ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

—কি বলছ মা? এত জরুরী তলব যে!

মা হুম্ হুম্ করিয়া দোতালায় উঠিতে উঠিতে ডাকিলেন, জরুরী তলবই বটে। আয় তো ওপরে।

কাজলী নীচে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের কি মাথা খারাপ হইয়াছে? খবর জরুরী নয়, গোপনীয়ও। সে আবার প্রসাধনে বসিল।

বিস্ময় নিত্যরূপেরও কম হয় নাই। মায়ের অনুসরণ করিয়া উপরে উঠিয়া বলিল, কি ব্যাপার বল তো?

এক গাল হাসিয়া মা বলিলেন, আজ বিষ্টুদের ওখানে গিয়েছিলাম।

নিত্যরূপ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বিষ্টুদের ওখানে যাওয়ার মধ্যে হাসির কি থাকিতে পারে! বলিল, তারপর?

—ওর মা কি বললে বল দিকি?

—বললে, দিদি কেমন আছ?

মা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন, যা বললে শুনলে বিশ্বাস করবি না। আমাকে তো খুব ক'রে বসালে। তা অবিশ্যি রোজই বসায়। মাগীর দেমাক-অহঙ্কার নেই। তা সত্যি কথাই বলতে হবে। শেষটায় আমার হাত দুখানি চেপে ধ'রে বললে, দিদি তোমার কাছে একটি ভিক্ষে আছে। আমার কাছে ভিক্ষে! আমি তো ভেবেই মরি! শেষে কি বললে জানিস?

নিত্যরূপেরও ক্রমেই কৌতূহল বাড়িতেছিল। বলিল, না।

—তোমার কাজলীকে আমায় দাও। ওকে আমি ছেলের বৌ করব।

কথাটা সত্যই বিশ্বাস না করিবার। নিত্যরূপ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। আর মা তার মুখের পানে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নিত্যরূপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিষ্টু আছে কেমন?

—ভালোই আছে।

নিত্যরূপও বাহিরে দিকে পা বাড়াইল।

মা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যাচ্ছিস যে? তোর কি মত ব'লে গেলি নে?

নিত্যরূপ দোর গোড়ায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এর চেয়ে সুখের খবর কি হ'তে পারে। অবশ্য যেখানে কাজলীর বিয়ের কথা চলছে সেও খুব ভালো পাত্র। কিন্তু তার চেয়ে আমি বিষ্টুকে বেশী চিনি। তার

হাতে কাজলীকে দিয়ে আমি বেশী নিশ্চিন্ত হব। আরও কি কথা জানো মা, বিষ্টু ও কাজলীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। ও যত ওর দোষ ত্রুটি ক্ষমা করতে পারবে এমন আর কেউ পারবে না। তাকে জিগ্যেস ক'রে তবে এ কাজে কাকীমা হাত দিয়েছেন কিনা জানিনা। তবে যদি তার কিছু আপত্তিও থাকে, আমি অনুরোধ করলে সে আর দ্বিধা করবে না। কিন্তু সে আমি করতে চাই না। সে যদি স্বেচ্ছায় মত দেয়—নিত্যরূপ হঠাৎ গলা নামাইয়া বলিল,—কিন্তু আমি বলি কি, এ বিষয় একবার কাজলীর মত নেওয়াও দরকার।

মা অবাক হইয়া বলিলেন, তুই বলিস কি রে! কাজলীর আবার…

—তবু নেওয়া ভালো। যাকে চেনে না তার সম্বন্ধে হয়তো আপত্তি করবে না। কিন্তু যাকে ভালো ক'রে চেনে তার সম্বন্ধে আপত্তি থাকতেও তো পারে। বুঝলে না?

মাকে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয়ের অবসরও না দিয়া নিত্যরূপ নামিয়া আসিল। নীচে তখনও কাজলীর প্রসাধন শেষ হয় নাই। তাহাকে দেখিয়াই নিত্যরূপ হাসিয়া ফেলিল।

—হ'ল কথা? বাবা, বাবা! কথা আর শেষ হয় না।

নিত্যরূপ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ। হ'ল কথা। বিয়ের কথা।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অবস্থা সকলেরই এক রকম ঃ

বিষ্ণুরথ মায়ের পত্র পাইয়া প্রথমত নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। একদিন ছিল যেদিন সে সমস্ত দেহ, মন ও আত্মা দিয়া কাজলীকে কামনা করিয়াছিল। সেদিন এই দুর্ভাবনার কথাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মনে উদয় হইয়াছিল যে, পল্লীসমাজের সংস্কার ও দেশাচারকে লঙ্ঘন করিয়া এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবে কিরূপে?

আজ সকল প্রয়োজনের শেষ হইয়াছে। দুর্ভাবনাও নাই। কামনার কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। মানুষের কামনা কিছু অত সহজে মরে না। কিন্তু নিজের উপরে আর তাহার নিজেরই শ্রদ্ধা নাই। দর্পণে নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই সে শিহরিয়া ওঠে। সে বিবাহ করিতে যাইবে কোন লজ্জায়? আকাশের চাঁদ অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত তো বটে, কিন্তু এই অবেলায় তাহা আর কোন্ কাজে লাগিবে?

একা ঘরে বসিয়া বিষ্ণুরথ আপনমনেই হাসিল ঃ

কাজলীর সেদিনের চোখের দৃষ্টি সে আজও ভোলে নাই। ভাবী রাজপুত্র স্বামীর উল্লেখ করিয়া যে দৃষ্টিতে সে বিষ্ণুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়াছিল তাহা তাহার মনের পাষাণে কাটিয়া দাগ বসাইয়াছে। রাজপুত্রের মতো অপরূপ কান্তি তাহার কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু সে সুস্থদেহ, ভদ্র বাঙালী সন্তান। একেবারে নাক সিট্‌কাইবার মতো কদর্য্য চেহারাও তাহার নয়। কিন্তু তাহাতেই যদি কাজলী অমন দৃষ্টি হানিয়া থাকে, আজ তাহার রূপ দেখিয়া সে তো বিবাহ সভায় মূর্চ্ছাই যাইবে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষ করিয়া মুখমণ্ডল কে যেন পোড়াইয়া

কালো করিয়া দিয়াছে। তাহার উপর বসন্তের দাগ। এমন চমৎকার যাহার কান্তি তাহার সাধিয়া অপমান বরণ করিবার আবশ্যকতা কি ?

তবু কাজলী আজ স্বেচ্ছায় তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। স্বেচ্ছায় বই কি ! পত্রে কাজলীর মায়ের উল্লেখ আছে। তিনি কি আর মেয়েকে লুকাইয়া এ প্রস্তাব করিয়াছেন ? ...র কাজলী যে মেয়ে ! তাহার ইচ্ছা যদি না থাকে, কাকমুখে এ কথা শুনিলেও সে প্রবল আপত্তি করিবে। ছোট মেয়ে তো নয়। আর সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের মতোও মানুষ হয় নাই। তাহার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিবার সাধ্য ও-বাড়ীর কাহারও নাই।

সেই কথাই ঠিক। কাজলীর অমত নাই। একদিন সাধিয়া যাহাকে পাওয়া যায় নাই, সে আজ স্বেচ্ছাতেই তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে যদি আজ বলিয়া বিদায় দেওয়া যায় তো কেমন হয় ?

বিষ্ণুরথের মুখে একটা ক্রুর উল্লাসের হিল্লোল খেলিয়া গেল। 'না' বলিয়াই কাজলীকে বিদায় দিতে হইবে। তবে না প্রতিশোধ ?

কিন্তু বিষ্ণুরথ শত চেষ্টাতেও ততখানি মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিল না। দুইদিন, তিনদিন, চারদিন, এক সপ্তাহ সে ভাবিল। ক্রমাগত ভাবিল। আহার বন্ধ, নিদ্রা বন্ধ, পড়াশুনা বন্ধ। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ, গল্প-গুজব, খেলা-ধূলা সমস্ত বন্ধ। অপরাহ্নে শরীর অসুস্থ বলিয়া প্রায়ই শুইয়া থাকে। কোনোদিন বা সকলে চলিয়া গেলে একলা গড়ের মাঠে ঘুরিয়া আসে। কিছুতে এলোমেলো চিন্তার আর শেষ হয় না।

অনেকদিন হইল একখানা খাম কিনিয়া আনিয়াছে। এতদিন সেখানা টেবিল-ঢাকা খবরের কাগজের তলায় রাখিয়া দিয়াছে। মায়ের

চিঠির উত্তর আর দেওয়া হইয়া ওঠে নাই। [illegible] অসম্মতি জানাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লিখিতে বসে, তখনই মনে পড়ে কাজলীর অসহায় শূন্যদৃষ্টি,—যাহা সেই বর্ব্বর কাণ্ডের পর তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হয়, সে দৃষ্টিতে তাহাও বুঝি একটু কাকুতিও ছিল।

কিন্তু মায়ের চিঠির উত্তর দিতে আর দেরী করাও চলে না। এমনিতেই তো সপ্তাহে একখানা করিয়া পত্র না দিলে মায়ের মনে উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। কিন্তু কি উত্তর দিবে সে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সে লিখিয়া দিল, তাহার বিবাহ করিবারই ইচ্ছা নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনো চেষ্টা না করিলেই সে সুখী হইবে। কাজলীর পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনো মন্তব্যই করিল না। পুনশ্চ দিয়া লিখিল, তাহার এই অবাধ্যতায় যেন কেহ কিছু মনে না করেন। তাহার জীবনের উদ্দেশ্যই স্বতন্ত্র। বিবাহ তাহার বিঘ্নস্বরূপ। আবার একটা পুনশ্চ দিয়া লিখিল, তাহার শরীর ভালো নয়। শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছে।

চিঠিখানি বিষ্ণুর মায়ের হাতে পড়িতেই তিনি হাঁউ মাউ করিয়া উঠিলেন। এ আবার কি কথা! এ মেয়ে না পছন্দ হয় অন্য মেয়ে আছে; কিন্তু বিবাহ করবে না, সে আবার কি?

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হইল, কর্ত্তাকে ডাক।

ঘন ঘন অন্দরে ডাক শোনা কর্ত্তার অভ্যাস নাই। সে জন্য যদি কখনও ডাক আসে, তিনি উঠিতে বিলম্ব করেন না। অনুমান করেন, বিশেষ কিছু গুরুতর কারণ ঘটিয়া থাকিবে।

তিনি যখন অন্দরে আসিলেন তখন গৃহিণী কাঁদিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিয়াছেন। চিঠিখানা আধ খোলা অবস্থায় সামনে পড়িয়া আছে।

বিষ্ণুর হাতে লেখা চিঠি। দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

কোনো প্রকারে গলা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি খবর?

গৃহিণী কথা কহিলেন না, শুধু বাঁ হাত দিয়া চিঠিখানা সুমুখের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া ত্রৈলোক্যবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। গৃহিণীর এই ভঙ্গিটা যে শোকের নয় ক্রোধের, তাহা তিনি জানেন। চিঠিখানা এক নিশ্বাসে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গৃহিণীর কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

মুখে আঁচল চাপা দিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে গৃহিণী বলিলেন, আর আমি একটা দিনও এখানে থাকতে চাই না। কালই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও।

ত্রৈলোক্যবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

—কেন, কি, হ'য়েছে কি?

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না, তিনি কিছুতেই থাকিবেন না।

ত্রৈলোক্যবাবু বুঝিলেন, এখানে একটু দেরী হইবে। তিনি আরাম-কেদারাটা গৃহিণীর কাছে সরাইয়া আনিয়া বসিলেন। ত্রৈলোক্যবাবু, যার ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়, তাঁর চো এখন কৌতুকে চিক্ চিক্ করিতেছে। বহুদিন পরে যেন একটু অবসর মিলিয়াছে। পুত্রের বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কিঞ্চিৎ রসিকতা করিতে চান।

বলিলেন, তুমি বাড়ী থাকবে না তো, ছেলের বিয়ে দেবার জন্য আমি একটা মাসী ভাড়া ক'রে আনব না কি?

গৃহিণী মুখ ঝাম্টা দিয়া বলিলেন, কী যে রসিকতা কর। অঙ্গ

জ্বলে যায়। শুনছ, ছেলে বিয়ে করবে না,—একে না ওকে না, কাউকে না। সে বিয়েই করবে না। আর যা একরোখা ছেলে তোমার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও তার ধনুকভাঙ্গা পণ ভাঙতে পারবে না।

কর্ত্তা গৃহিণীর পানের ডিবা হইতে একটি পান তুলিয়া লইয়া আলগোছে টুপ্ করিয়া মুখে ফেলিলেন। আঙ্গুলে করিয়া একটু জর্দ্দা তুলিয়া মুখে দিলেন। তারপর পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরে-সুস্থে কহিলেন, অত বড় কথাটা যখন মুখ ফুটে বলেই ফেললে গিন্নী যে, ছেলে আমার, তখন আমি একটা কথা নিবেদন করি। শুনবে?

এক চোখে আঁচল ঘষিতে ঘষিতে, আর এক চোখে হাসিতে হাসিতে গৃহিণী বলিলেন, বল।

—আমি বলি, তুমি নির্ভয়ে বিয়ের যোগাড় কর। বিষ্টু কি লিখেছে, না লিখেছে সে কথা কাউকে জানাবারও দরকার নেই। আমি আজ ভট্‌চায্ মশায়কে ডাকিয়েছিলেম। তিনি বললেন, এগারোই অঘ্রান বিয়ের দিন আছে। আমি বলি, আর দেরী ক'রে কাজ নেই। ওই প্রথম দিনেই দেওয়া যাক। কি বল?

গৃহিণী বিস্মিত ভাবে কহিলেন, তুমি বলছ কি গো?

কর্ত্তা হাসিয়া জমিদারী চালে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ঠিকই বলছি। আমার ছেলে, আমি চিনি না?

—কিন্তু তখন যদি ছেলে....

—তাহ'লে আমার কান ম'লে দিও।

ভ্রূকুটি করিয়া গৃহিণী বলিলেন, আবার!

বহু পুরাতন একটা কথা উভয়েরই মনে পড়িয়া গেল। তখন উভয়েরই ভরা যৌবন। কি একটা কথায় ত্রৈলোক্যবাবু আজিকার মতো কান মলিয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন। রাগে, দুঃখে এবং পাপের ভয়ে

গৃহিণী কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রে কি করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু যে তাঁহার মান ভাঙাইয়াছিল, সে শুধু তাঁহারা দু'জনেই জানেন। এতদিন পরে সে কথা স্মরণ করিয়া আজও উভয়ের মন সলজ্জ মধুর রসে আপ্লুত হইয়া গেল।

ত্রৈলোক্যবাবু তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিলেন, আর বলব না। হয়েছে তো?

গৃহিণীও সায় দিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

একটু থামিয়া ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, বিষ্টুকে কিছু জানাবার দরকার নেই। তুমি বিয়ের কথা পাকাপাকি ক'রে ফেল। শুধু তাকে আসতে লিখে দাও। সে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ত্রৈলোক্যবাবু আর একটি পান মুখে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বেচারা কাজলী পড়িয়াছে মুস্কিলে:

এ সকল ক্ষেত্রে নায়িকার প্রায় দরদী সখী থাকে, যাহাদের কাছে হাসা যায়, দুঃখের কথা কহিয়া কাঁদা যায়। কাজলীর সখী বলিতে একটিও নাই। সে এ গ্রামে আসিয়াছে বড় বয়সে। তাহার সমবয়সী যাহারা তাহাদের অনেকেরই তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বাকী সকলেরও দেখিতে দেখিতে হইয়া গেল। প্রথম প্রথম তাহারা কাজলীর সঙ্গে মিশিত। কিন্তু সে অনেকটা কৌতূহলের বশে। কাজলী যে সকল গল্প করিত ইহারা সে সকলের সহিত পরিচিত নয়। ভালোও লাগিত না। পক্ষান্তরে ইহাদের গল্পও তাহার কাছে প্রীতিকর মনে হইত না। এত অল্প বয়সেই ইহারা অবলীলাক্রমে এমন সমস্ত গল্প করিত যে কাজলী লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিত না। বিবাহ হওয়ার ফলে, অল্প

বয়সেই ইহারা পাকিয়া ঝুনা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে বেশী মিশিবারই বা তাহার অবসর কোথায়? দাদার অত্যাচারে সকালটা তাহার পড়া তৈরী করিতেই কাটিয়া যায়। মাথা তুলিবার সময় থাকে না। দুপুরে পড়া দেওয়া আছে। নিত্যরূপের অবশ্য কলেজ আছে। কিন্তু তাহার যখন কলেজ খোলে তখন হয়তো ইহারাও সকলে শ্বশুরালয় চলিয়া যায়।

এমনিভাবে সমবয়সীদের সঙ্গে তাহার কোনোদিনই সখিত্ব স্থাপনের সুযোগ হয় নাই। আজ তো তাহারা দুই-তিন সন্তানের জননী। দেহ-মন সব দিক দিয়া প্রবীণ হইয়া গিয়াছে। এবং যদিচ কাজলী আগামী বৎসর একটা পাশ দিবে, তথাপি তাহারা যেন কাজলীকে ছেলেমানুষ বলিয়াই মনে করে। তাহাদের রকম-সকম ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া কাজলীরও নিজেকে ছোট মনে হয়।

সুতরাং সে একা। মনের কথা খুলিয়া বলিবে এমন লোক নাই।

একদা কোন্ সুলগ্নে যৌবন আসিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়াছিল। অকারণেই সেদিন হয়তো সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে তাহাকে জাগাইয়া দিবার তো কেহ ছিল না। কি যেন একটা নেশায় তাহার দেহের প্রত্যেকটি অণু পরমাণু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আছে। যে লাবণ্য তাহার সমস্ত দেহে অপরূপ রূপসৃষ্টি করিয়াছে কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তে তাহার পানে অপাঙ্গে চাহিলে তাহার নিজেরই মন দুঃসহ পুলকে ঝিমাইয়া আসে। কিন্তু সে কতক্ষণ! একটু পরেই সেই মন লইয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বীজগণিতের দুরূহ অঙ্ক কষিতে বসে।

কিন্তু এই মনও একদিন জাগিল: বসন্তের পুষ্পবনে নয়, চাঁদের আলোয় নয়, সহস্র পাখীর কলকণ্ঠেও নয়। জাগিল কালবৈশাখীর

গোধূলিবেলায়। বিদ্যুচ্চমকে সে যেন আপনাকে নূতন করিয়া দেখিল,—এমন করিয়া আর কোনো দিন দেখে নাই। তাহার মনে হইল, সে রাজরাজেশ্বরী। বর্ষণমুখর, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারে শুধু বিষ্ণুরথ নয়, সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার পায়ের কাছে মাথা নীচু করিয়াছে।

যথাকালে ঝড় থামিল, কিন্তু তাহার মনের ঝড় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সে ঝড় সমস্ত দেহকে থাকিয়া থাকিয়া নাড়া দেয়। কিছুতে সুস্থির হইতে দেয় না। অথচ সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়া যে তাহার যৌবনকে জাগাইল তাহার আর নাগাল পাওয়া যায় না। যদি কোনো সুযোগে তাহার দেখা পায়, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কাজলী তাহাকে জর্জ্জরিত করে। বিষ্ণুরথ তাহার কিছু মাত্র অপ্রীতিভাজন নয়, তবু বারে বারে তাহাকে আঘাত দিতে ভালো লাগে, তাহার ব্যথিত মুখের পানে চাহিলে মন অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে নাচিয়া ওঠে। বাজীকর যেমন নাচাইবার জন্য বারে বারে সর্পকে খোঁচা দেয়, সেও তেমনি বারে বারে বিষ্ণুরথকে খোঁচা দেয়। কিন্তু বিষ্ণুরথ আর কিছুতে যেন ফণা তুলিয়া নাচে না, মাথা নীচু করিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে। কাজলীরও তত জেদ চড়িয়া যায়।

অবশেষে····

কিন্তু তাহার সেই বিজয় কাহিনীই যে কোনো সখীকে নিভৃতে পাশে বসাইয়া কুন্দদন্তে হাসি চাপিয়া একটি একটি করিয়া বলিবে এমন সখী তাহার নাই। বেচারা কাজলী বড় মুস্কিলেই পড়িয়াছে।

পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে কলেজ বন্ধ হওয়ার আগেই বিষ্ণুরথ বাড়ী আসিল। শরীর তাহার সত্যই ভালো নয়। এখান হইতে যেমনটি গিয়াছিল, তেমনিটি ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার বাবা ও মা বার বার তাহাকে কোনো একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। সে নিজে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। বলিয়াছিল, কলিকাতার জলহাওয়া বরাবরই তাহার স্বাস্থ্যের উপকার করে। সেখানে গেলেই শরীর সারিয়া যাইবে।

কলিকাতায় তাহার শরীর থাকেও ভালো। এখানে পঞ্চব্যঞ্জন-ভাত এবং উপযুক্ত পরিমাণ দধি-দুগ্ধে যে উপকার না হয়, মেসের ডাঁটা-চচ্চড়িতে তাহার সেই উপকার হয়। একথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় বটে, কিন্তু ইহা সত্য। ত্রৈলোক্যবাবু সেই জন্যই আর বিশেষ আপত্তি করেন নাই। তাহার উপর কলেজ খুলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এবারে পুত্রের স্বাস্থ্য দেখিয়া বুঝিলেন, কলিকাতার মেসে থাকিয়া এ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশা দুরাশা। সামনের কার্ত্তিকেই পূজা। তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব। এ কয়টা দিন এখানেই কোনো রকমে কাটাইয়া ত্রয়োদশীর দিন মধুপুর অথবা দেওঘর, অথবা অন্য কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছুদিন কাটাইতে হইবে। এ বিষয়ে আর কোনো আপত্তি শুনিলে চলিবে না।

বিষ্ণুরথ আসিয়া পর্য্যন্ত উস্‌খুস্ করিতেছে। আসার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কেহ কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করিতেছে না। মা তাহার শরীরের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত। তাঁহার

কার্য্যকলাপে মনে হয়, সম্মুখে পূজা এবং তার পরেই বায়ুপরিবর্ত্তন—ইহা ছাড়া আর কোনো সঙ্কল্প তাঁহার মনের মধ্যে নাই। বাবা তাহার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও কথা বলেন। তাহাও অতি অল্প। তিনিও গুণ গুণ করিয়া একবার শুধু তাহার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন; আর কিছু বলিলেন না।

নিত্যরূপদের বাড়ী যাওয়ার পথও বন্ধ। বন্ধ অবশ্য কেহই করিয়া দেয় নাই। কিন্তু বিবাহের কথা যখন একবার উঠিয়াছে,—তা সে বিবাহ হউক, আর না হউক,—তখন সেদিকে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হইবে না। অন্তত বিষ্ণুরথের লজ্জা করে। যাইতে পারে না।

কাজলীর মা ইহার মধ্যে একদিন আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে কি, বহু গবেষণা করিয়াও বিষ্ণুরথ তাহা স্থির করিতে পারে নাই। তবে তাহার মন একটু দমিয়া গিয়াছে। ভাবী জামাতার সঙ্গে শ্বশ্রূমাতা যেরূপ সামাজিক ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাহার সঙ্গে যে ভাবে আলাপ করিতেন, এই দিনও সেই ভাবে আলাপ করেন। অত্যন্ত সহজ আলাপ। তাহার মধ্যে সামাজিকতা ছিল না।

ইতিমধ্যে একদিন নিত্যরূপ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া বিষ্ণুরথ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে যে কি ভাবে তাহাকে সমাদর করিবে ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু নিত্যরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিতে লাগিল,—

—*তুমি ক'দিনই হ'ল এসেছ খবর পেয়েছি। কিন্তু একবার যে এদিকে আসি তার আর সময় ক'রে উঠতে পারিনি।*

বিষ্ণুরথ আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নিত্যরূপ বলিতে লাগিল, শুনেছ বোধ হয়, এন্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটি খোলা হয়েছে। না, না, বাইরের চাঁদা নেই বললেই হয়। মানে, চাঁদা কারো কাছে চাওয়া হয়নি। যারা স্বেচ্ছায় দিয়েছে তাদেরই চাঁদা নেওয়া হ'য়েছে। ও দুষ্কর্ম্ম আবার করি!

বলিয়া হাসিতে লাগিল।

—কাজ হচ্ছে কিছু?—বিষ্ণুরথ ধীর ভাবে জি করিল।

—ওই কিছুই হচ্ছে। বহু কষ্টে গোটা দুই ডোবা ভরা করা হয়েছে। তাও যাদের ডোবা তাদের অনুগ্রহ না থাকিলে হ'ত কিনা সন্দেহ। আর মাঝে-মাঝে কয়েকটা জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। সে কিছুই নয়। তবে লেগে থাকলে হয় তো কিছু হবে।

বিষ্ণুরথ কিছু বলিল না

একটু থামিয়া নিত্যরূপ বলিল, তোমার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তোমাকে আর এখন এর মধ্যে টানব না এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু এমন মুস্কিলে পড়ে গেছি....

মুস্কিলটা কি জানিবার জন্য বিষ্ণু উৎসুক নেত্রে চাহিল।

একটু ফিকা হাসিয়া নিত্য বলিল, মুস্কিল হয়েছে তোমাদের ওই আমবাগানটা নিয়ে। বলতে গেলে ওটা একেবারে আমাদের পাড়ার মধ্যখানে। যত মশার আড়ৎ হচ্ছে ওই বাগানের জঙ্গল, শেষ ক'রে ওই পুকুরটা। তোমার বাবাকে বললে তিনি যে আপত্তি করবেন তা মনে হয় না। কিন্তু নানা কারণে তাঁর কাছে আমি নিজে যেতে চাই না। অথচ আর কেউ গেলে যে হবে তাও দেখতে পাচ্ছি না।

বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে বিষ্ণুর পানে চাহিল।

বিষ্ণু নিঃশব্দে নত মুখে বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। তাহার উপর নিত্যরূপের দৃষ্টি অনুভব করিয়া বলিল, আমার কথা আপনি তো

সবই জানেন। বাবাকে আমি কখনও কোনো জিনিসের জন্যে বলিনি।

—তাই তো!—বলিয়া নিত্য চিন্তিত ভাবে পা দুলাইতে লাগিল।

একটুক্ষণ পরে বিষ্ণুরথ বলিল, আচ্ছা, আপনি যা করতে যাচ্ছেন তাতে কি বাবার মত নেওয়া নিতান্তই দরকার? যদি সামান্য কিছু হয়, মালীকে আমি ব'লে দিলেই তো হ'তে পারে। খরচ যা হবে তাও না হয় আমি দোব। কিন্তু যদি বেশী কিছু হয়....

তাহা হইলে কি হইবে তাহা বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন নাই বলিয়াই সে চুপ করিল।

নিত্যরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা ভাবিয়া দেখিল। বিষ্ণু তাহার পিতার একমাত্র পুত্র। নিতান্ত নাবালকও নয়। পিতার কাছে তাহার কথার মূল্য কতটুকু তাহা সে জানে। সে যে কিছুতেই পিতার কাছে যাইতে সম্মত হইবে না সে-আশঙ্কাও তাহার মনে মনে বরাবরই ছিল। শুধু আর কোনো দিকে দিশা পায় নাই বলিয়াই তাহার কাছে আসিয়াছিল। তাহার শেষের কথাটায় নিত্যরূপ যেন খানিকটা আশার আলো দেখিতে পাইল। বাগানের মধ্যস্থলে যে জলাশয়টা আছে তাহাকে ঠিক ডোবা বলা চলে না। ডোবার চেয়ে বড়, পুষ্করিণীর চেয়ে ছোট। মাথা খুঁড়িলেও সেটি ভরাট করিবার অনুমতি ত্রৈলোক্যবাবু যে দিবেন না তাহা সুনিশ্চিত। তবে সেটি এবং বাগানের সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিলে হয়তো তাহাতে আপত্তি করিবেন না। তাহাতে ব্যয়ও খুব বেশী হইবে না। বোধ করি বিষ্ণুরথ নিজেই খরচটা বহন করিতে পারিবে।

নিত্যরূপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাহ'লে বরং চল, তুমি নিজেই একবার দেখবে। তারপরে যা ভালো বোধ হয় পরামর্শ ক'রে করা যাবে। কি বল?

—চলুন।

বলিয়া বিষ্ণুরথও উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুবিস্তীর্ণ বাগানের স্থানে স্থানে যে এত জঙ্গল হইয়াছে অভ্যাস বশত তাহা একদিনও বিষ্ণুরথের চোখে পড়ে নাই। এক এক জায়গায় আগাছার জঙ্গল এত ঘন যে সেখানে দিনের বেলাতেও বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। নিজের ছেলেবেলায় ত্রৈলোক্যবাবু কয়েক স্থানে ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলেন। কোথাও কোথাও কুঞ্জবনের মতো করিয়াছিলেন। সে ফুল গাছের কিম্বা কুঞ্জবনের চিহ্নমাত্র এখন নাই। সমস্ত স্থানে আগাছা জন্মাইয়া জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। সে গুলা পরিষ্কার না করিয়া ফেলিলে সত্যই চতুষ্পার্শের স্বাস্থ্যহানি হইবে। আর ডোবাটা....

সেটার জল নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপে অবিরত পঙ্ক হইতে বুদ্বুদ উঠিতেছে। আর বহুসংখ্যক ব্যাঙ তাহাতে স্বেচ্ছামত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। গাছের পাতা পড়িয়াছে অনেক। কতক পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, কতক নোঙরবিহীন নৌকার মতো হাওয়ায় ঘুরপাক খাইতেছে।

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, জঙ্গলটা না হয় আমি মালীকে দিয়ে সাফ করাচ্ছি নিত্যদা, কিন্তু পুকুরটা ?

জঙ্গল পরিষ্কার করিতে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না তাহা নিত্যরূপ মনে-মনে আন্দাজ করিয়াছিল। মুস্কিল হইবে এই পুকুরটা লইয়া। এটা পরিষ্কার করাইতে যে পরিমাণ সোর গোল হইবে, তাহাতে পূর্ব্বাহ্নে ত্রৈলোক্যবাবুর সম্মতি না লইয়া এ কাজে হাত দিতে কাহারও সাহস হয় না।

অনেক চিন্তার পর নিত্যরূপ হাসিয়া বলিল, যাকগে, অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। আপাতত জঙ্গলটাই তো সাফ হোক। তারপর দেখা যাবে।

ত্রৈলোক্যবাবুর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যেরূপ ধারণা বিষ্ণুরথের ঠিক তাহার বিপরীত। সেজন্য পিতার সম্বন্ধে কথা উঠিলে লোকে যখন পাশ কাটাইতে চায়, তখন সে মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং দুঃখিত হয়। সে বেশ ভালো করিয়াই জানে, কতকগুলি বিশেষ খেয়াল ছাড়িয়া দিলে তাহার পিতা লোক মন্দ নহেন। বরং সাধারণ পাঁচ জনের উপকার হইবে এ কথা বুঝাইয়া দিলে তিনি সেজন্য যে ক্ষতি স্বীকার করিবেন, এমন আর কেহ পারিবে না। মুস্কিল এই হয় যে, সে কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য সাহস করিয়া কেহ অগ্রসর হইতে চায় না, এবং নিজের ভীরুতা ঢাকিবার জন্য অবলীলাক্রমে তাঁহার উপর দোষার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

বিষ্ণুরথ একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, কিন্তু তাও ত্যাগ করতে হয় না নিত্যদা, আপনি নিজে যদি একবার বাবার কাছে যান। তাঁকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, তিনি নিশ্চয় 'না' বলবেন না।

কিন্তু নিত্যরূপের অন্য আপত্তি ছিল। কাজলীর সঙ্গে বিষ্ণুর বিবাহ প্রায় পাকা হইয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহার কাছে কোনো কিছুর জন্য আবদার করা চলে না। অথচ এ কথা বিষ্ণুরথকে জানাইতে পারিতেছিল না। সে কহিল,—

—এত তাড়াতাড়ি কি? আগে জঙ্গলটাই তো পরিষ্কার হোক, তারপর ওটা একসময় হলেই হবে।

বিষ্ণুরথ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, সে মন্দ নয়।

কাজের কথার বাহিরে নিত্যরূপের মুখ চলিতে চায় না। নিজের স্বাস্থ্যের জন্য সে কখনও উদ্বিগ্ন হয় না। অপরের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিবার কথাও তাই তার কখনও মনে হয় না।

রোগ হইলে সে শুশ্রূষার জন্য ছুটিয়া যায়। রোদ বৃষ্টি মানে না। এই তাহার ব্রত, এবং সকল ব্রতের মতো এই ব্রতও ধীরে ধীরে তাহার মনকে যন্ত্রের মত নীরস ও নির্ভুল করিয়া তুলিতেছে।

এতক্ষণে বিষ্ণুরথের কৃশ দেহ ও শীর্ণ মুখের দিকে নিত্যরূপের দৃষ্টি পড়িল। কহিল, তোমার শরীর তো এখনও সারতে পারলে না বিষ্ণু?

ঈষৎ হাসিয়া বিষ্ণু কহিল, সারবে আস্তে আস্তে।

—না, না, আস্তে আস্তে নয়। পূজোর পরে তোমার চেঞ্জে যাওয়ার কথা শুনছিলাম। আমারও মনে হয়, সেই ভালো। দেরী করা কাজের কথা নয়।

বিষ্ণুরথ আর একবার নিঃশব্দে হাসিল।

নিত্যরূপ বলিল, আচ্ছা, আমি তাহ'লে আজকে আসি। কাল আর একবার আসব। আমার আবার ওপাড়ায়....

নিত্যরূপ চলিয়া গেল।

নিত্যরূপ চলিয়া গেলেও বিষ্ণুরথ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা করিতেছিল আসল যে কথাটি সে বলিতে ভুলিয়া গেল, এখনই ফিরিয়া আসিয়া সে কথাটি বলিয়া যাইবে। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না। বাগানের প্রাচীরের অন্তরালে তাহার দেহ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিষ্ণুরথ বিরক্তভাবে আপনার মনেই হাসিল। এই রকমই বটে! যে যাহার নিজের স্বার্থ লইয়াই আছে। বাবা আছেন তাঁহার জমিদারী লইয়া। মা আছেন কি করিয়া তাঁহার ছেলের দেহটাকে

খাওয়াইয়া পরাইয়া নধরকান্তি করিবেন। আর নিত্যদা আছেন রাস্তা আর ঘাট, কলেরা আর ম্যালেরিয়া লইয়া। মোটা মোটা ইংরাজী বইতে যত বড় বড় ভালো ভালো কথা আছে ভাবিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি নিজের ব্যবহারিক জীবনে খাটাইতে পারিলে নিজেরও দুঃখ ঘুচিবে বিশ্বমানবেরও দুঃখ ঘুচিবে। নিত্যরূপকে বিষ্ণুরথের নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া মনে হইল। এত পড়াশুনা করিয়া, এত মানুষ দেখিয়াও তিনি আর কিছুতে আঠারো বৎসর বয়সকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। দুঃখ যে মানুষের জীবনে কখন কোন পথ দিয়া আসে, খাওয়া-পরা এবং আধি-ব্যাধির দুঃখই যে একমাত্র দুঃখ নয়, বৃহত্তর জীবনের বৃহত্তর দুঃখের কাছে যে সে সকল নিতান্তই তুচ্ছ এ জ্ঞান আজও তাঁহার হইল না। হয়তো কোনো দিনই হইবে না।

বাগানের মধ্যে বিষ্ণুরথ অত্যন্ত অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার মালীকে ডাকিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য যাহা যাহা করণীয় সে সম্বন্ধে আদেশ দান করিল। মালী হুঁসিয়ার লোক। সমস্ত কথা শোনার পর জিজ্ঞাসা করিল, টাকা! বিষ্ণুরথ বলিল, টাকা যাহা খরচ হইবে সে নিজেই দিবে। মালী আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল। এ বাগানে এক আমের সময় ছাড়া অন্য সময়ে উপরি আয়ের সম্ভাবনা নাই।

বাঁ দিকে অনতিদূরেই কাঁচা-মিঠে আম গাছটা বিষ্ণুর অতি প্রিয়। ভালো ভালো বহু আমের গাছ ত্রৈলোক্যবাবু নানা দেশ হইতে অনেক খরচ করিয়া আনাইয়াছিলেন। কিন্তু কাঁচা-মিঠের কাছে সকলেরই হার। সে একেবারে কাঁচাতেই আকর্ষণ করে।

বিষ্ণুরথ এদিক-ওদিক খানিকটা তাকাইয়া টহল দিয়া অবশেষে তাহারই তলায় ঘাসের উপর গিয়া বসিল। ছেবেবেলার চিন্তালেশ-

হীন আনন্দময় দিনগুলি তাহার চোখের উপর রঙীন্ মেঘের মতো ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জীবনের প্রথম কয়েকটা দিন তাহার এই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেই কাটিয়াছে। সে তখন তাহার চাকরের জিম্মায়, এবং জমিদারপুত্রের বাহিরের লোকের সঙ্গে মিলিবার অধিকারও ছিল না। দিবসের অধিকাংশ কাল তখন তাহার এই খানেই কাটিত। কখনও মালীর সঙ্গে গাছ তদারক করিত, পুকুরের ঘাটে বসিয়া ছিপে মাছ ধরিত, সুশীতল কুঞ্জবনে কখনও বা মুক্ত প্রান্তরে পা ছড়াইয়া বসিয়া বিবিধ বর্ণের পাখীর কূজন শুনিত। তারপর বেলা শেষ হইয়া আসিলে মালীর দেওয়া ফুলের তোড়া হাতে লইয়া চাকরের হাত ধরিয়া বাড়ী ফিরিত।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে বিষ্ণুরথ ভাবিল, সে দিন কি আর ফিরিয়া আসে না!

সেও একটা দীর্ঘ দিন, একটা দীর্ঘ জীবন। এই পৃথিবীর ধূলা মাটির মধ্যে বসিয়াই ধূলামাটির বাহিরের নির্ম্মল একটা জীবনধারা নৃত্যপরা নির্ঝরিণীর মত বাধাবন্ধহীন বহিয়া চলিয়াছিল। তরঙ্গিত জলধারায় সূর্য্যকিরণ ঝলমল করিয়া উঠিত, সূর্য্যাস্তমেঘ হোলী খেলিত, চন্দ্রকিরণে গলিত স্বর্ণ টলমল করিত।

দেখিতে দেখিতে কখন সে স্রোত ঘোলাটে হইয়া উঠিল—সে তারিখটি আজ আর কিছুতে স্মরণ করা যায় না। হয়তো কোনো একটা বিশেষ তারিখে এই পরিবর্ত্তন আসেও নাই। নদী যেমন করিয়া লোকচক্ষুর লক্ষ্যীভূত না হইয়া গতি পরিবর্ত্তন করে, তার চেয়ে অলক্ষ্যে আসে মানবমনের পরিবর্ত্তন। হঠাৎ এক সময় মানুষ সবিস্ময়ে ভাবিতে বসে, এ আবার কি হইল! বেশ তো ছিলাম। এ আবার কোথায় আসিলাম! কিন্তু তখন আর পিছনে

চাহিয়া মনের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও দিশা পাওয়া যায় না। বেশী ভাবিতে গেলে মন শ্রান্ত হয়। কেমন একটা নৈরাশ্য আসে। মনে হয় এ জীবনে সকল আনন্দের অবসান হইয়াছে। এর পরে যতদিন এই ব্যর্থ জীবনের বোঝা বহিতে হইবে, কেবলই দেনা-পাওনার খেলা চলিবে। কিছু না দিলে আর কেহ কিছু দিবে না,—স্নেহ না, মমতা না, ভালোবাসা না, কিছুই না। অতঃপর মানুষ এক হাতে লইবে, আর হাতে দিবে। এমন বেচা-কেনা চলিবে কতকাল কে জানে। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে জীবনের শতছিদ্র তরণী অবশেষে একদিন হয়তো ঘাটে ভিড়িবে, হয়তো ভিড়িবে না। মধ্যপথেই সকল দুর্ভাগ্যের ভরাডুবি হইবে।

হঠাৎ সম্মুখে একটা মানুষ অমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িলে মানুষ মাত্রই চমকিয়া ওঠে। বিশেষ বিষ্ণুর মতো একটা ছেলে। কিন্তু কাজলী যে সেজন্য এতটুকু চমকিয়া উঠিল এমন মনে হইল না। সে যেন এইরূপ একটা কোনো সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মাথা নীচু করিয়া কাজলী পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু সরু বনপথ। তাহাতে বিষ্ণুরথ দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ কাটাইবার উপায় ছিল না। কাজলী অধরে হাসি টানিয়া, নয়নে ভ্রূকুটি হানিয়া বলিল, সরো, ছি!

কিন্তু অধরে যাহার হাসি তাহার ধিক্কারে কেহ ভয়ে পথ ছাড়িয়া দেয় না। বিষ্ণু অবিচলিতভাবে তদ্বৎ দাঁড়াইয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

স্থানটি বিষ্ণুরথদের বাগানের অভ্যন্তর হইলেও এইটিই ওপাড়া হইতে

এপাড়া আসিবার সহজ পথ। সুতরাং একেবারে নির্জ্জন বলা যায় না কিন্তু বিষ্ণুরথের বোধ হয় সে জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। নহিলে অম প্রকাশ্য স্থানে উদ্ভিন্নযৌবনা একটি মেয়ের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিত না। কাজলী একবার তাহার জ্বালাময় উগ্র চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিল। পরক্ষণেই লঘু ত্রস্ত পদে বাঁদিকের পথ ভাঙ্গিল।

বিষ্ণুরথ প্রথমটা হতচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিক দিয়া অবশ্য বাহিরে যাইবার রাস্তা নাই। কিন্তু সে কথা তখন কে চিন্তা করিয়া দেখে! কাজলীর সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য তাহার মন অনেক দিন হইতে পুড়িয়া মরিতেছে। নিভৃতে তাহার সঙ্গে অনেক কথা কহিবার আছে। সে যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে—সেটাই জানা প্রয়োজন। কিন্তু চঞ্চলা কিশোরী তাহার সান্নিধ্য হইতে কেবলই পিছলাইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। বিষ্ণুরথ তাহার পিছনে-পিছনে ছুটিল।

অনতিদূরেই কয়েকটা করবী গাছ একটা ঝোপের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার আড়ালে গিয়াই অকস্মাৎ কাজলী পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। বিষ্ণু তখন একেবারে তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কাজলীর উঠিবার শক্তি নাই। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পরাজিত ভাবে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিষ্ণুরথ নিঃশব্দে আসিয়া তাহার একটু দূরে ঘাসের উপর বসিল, এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া কোনো দিকে না চাহিয়া বলিতে লাগিল :

—এবার এসে পর্য্যন্ত আমি যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি সে আমিই জানি। আমার এমন সর্ব্বনাশ করেছ তুমি। নিদ্রায় জাগরণে কিছুতেই তোমাকে ভুলতে পারছি না। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, দিনরাত্রি

কাঙালের মতো তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। হাসছ? তুমি তো হাসবেই। তুমি কি বুঝবে এ কি যন্ত্রণা! এ যন্ত্রণা কীটের মতো মানুষের মন, বুদ্ধি, চৈতন্যকে কেমন ক'রে কুঁড়ে-কুঁড়ে দিচ্ছে! তোমার মনে হাসির অভাব হবে কেন বল? তোমার তো পরের কথা ভেবে ভেবে আহার-নিদ্রা বিষিয়ে ওঠে নি?

—তা ওঠে নি।

গম্ভীরভাবে এই কয়টি কথা বলিতে গিয়াই কাজলী আরও জোরে হাসিয়া ফেলিল। মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাজলী পাশ ফিরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বিষ্ণুরথ যেন পাদরী সাহেব গীর্জ্জায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে।

কিন্তু বিষ্ণুরথ নিজের বক্তব্যের হাস্যকরতা সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। ভাবী জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নর ও নারীর নিগূঢ় সম্বন্ধের মাধুর্য্য ও তাহার অভাবের পরিণাম—ভাবলোকের এই সকল দুরূহ সমস্যা সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়া যত দার্শনিক গবেষণা করিয়াছে, এইটুকু মেয়েরু কাছে সমস্তর অবতারণা সে করিতে চায়। কল্পনাবিলাসী আরও পাঁচ জন ছেলের মতো বিষ্ণুরথের ভাবলোকে স্বচ্ছন্দ এবং অবাধ গতিবিধি। সেখানকার ঈষন্নীলাভ আলোয় দৃষ্টিও খেলে ভালো। কিন্তু মেয়েরা এই পৃথিবীর মাটির উপরই যোটে। তাহারা নেশা লাগায়, কিন্তু নিজেরা নেশায় পড়ে ক্বচিৎ। তাহাদের জীবনে এবং কার্য্যেও ভাববিলাসের অবকাশ কম। সেজন্য অপাঙ্গের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণের হাসি এবং লজ্জাজড়িত বাক্য যত বাঁকাই হোক, তাহাদের কার্য্যপ্রণালী অত্যন্ত সরল এবং স্পষ্ট।

বিষ্ণুরথ যে এই কয়দিন তাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, আপনার গৃহকোণে বসিয়াই কাজলী তাহার

ঘরের ঠিকানা

নারীসুলভ শক্তিবলে টের পাইতেছিল। আজ তাহার মুখ দেখিয়া কাজলীর দয়াও হইয়াছিল। তাই সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করিবার জন্যই করবী গাছগুলির অন্তরালে ধরা দিয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুরথ নিতান্ত ছেলে মানুষ। কেবল লম্বা লম্বা কথাই বলিয়া যায়।

সে সকাতরে বলিতে লাগিল, তুমি শুধু একবার জানাও কাজলী, আমার হৃদয়লক্ষ্মী হবে কি না, আমি আমার ভাবী জীবনের পথ ঠিক ক'রে নিই। একটিবার জানাও। আমি পড়াশুনো বন্ধ রেখে শুধু এই কথাটি জানবার জন্যেই এত দূর....

পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া মানুষ আর কতক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে? বিরক্তভাবে কাজলী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং শিশুকে যেমন করিয়া শাসন করে তেমনি করিয়া বিষ্ণুরথের মাথায় গোটা কয়েক ঝাঁকি দিয়া কাজলী বলিতে বলিতে চলিয়া গেল,—থাম, থাম, আর বাজে বক্তৃতা দিতে হবে না।

বিষ্ণুরথ হতভম্বের মতো চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, বাতাসে কাজলীর পিঠের কাপড় নৌকার পালের মতো ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিপুষ্ট তনুলতা দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। বিষ্ণুরথের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। যেখানটিতে কাজলী শয্যা বিছাইয়াছিল সেখানকার তৃণ দল তখনও যেন আবেশে নত হইয়া ছিল। সে স্থানটি বার বার চুম্বন করিয়া বিষ্ণু অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় বলিতে লাগিল, —নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর....

করবী গাছের অন্তরালে এই কাণ্ড ঘটিল। একে বাগানের মধ্যে, তার উপর করবী গাছের অন্তরালে। কিন্তু তবু কি করিয়া মানুষের দৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। কে যে এই দৃশ্য দর্শন করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না। এই ব্যাপারে জমিদার-নন্দন আছে বলিয়া বোধ হয় সে আত্মগোপন করিল। দূর হইতে সে কিছু সমস্ত কাণ্ড দর্শন করে নাই। কিন্তু কথাটা যখন রটিল তাহা আসলকেও ছাপাইয়া গেল। আলোচনা আরো বেশী মনোরম হইল এই জন্য যে, উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাটা একেবারেই পাকা হইয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে কোর্টশিপের প্রচলন নাই। ক্বচিৎ কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেলে লোকের আর আমোদের অবধি থাকে না।

কাজলীকে তো পাড়ার মেয়েরা ছাঁকিয়া ধরিল। কেহ টিপিয়া টিপিয়া রসিকতা করে, কেহ চিম্‌টি কাটিয়া কাছে ঘেঁসিয়া আসে। কাহারও কথায় কাজলী মুখ রাঙা করিয়া ছুটিয়া পালায়, কাহাকেও ভ্রূভঙ্গি করিয়া শাসায়। তাহাতে তাহার দৈনন্দিন কাজের কোনো বিঘ্ন হয় না। বাহিরেও বাহির হয়, পাঁচজনের বাড়ীও যায়। এমনই বা লজ্জা কি? কাল যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, আজ তাহার সঙ্গে গোপনে একটু দেখা হইলই বা!

কিন্তু কথাটা আড়ালে-আবডালে শুনিয়া লজ্জায় ও দুশ্চিন্তায় বিষ্ণুর তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। এখানকার লোকগুলা কী! শুধু একবার দেখা, তাও কয়েক মিনিটের জন্য। তাই লইয়া একজন ভদ্রলোকের কন্যার নামে ইহারা অত্যন্ত অবলীলাক্রমে কি কথাই না রটনা

করিতেছে! এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে এমনি নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণে কি ইহাদের জিহ্বা কাঁপে না? যে ভয় সে করিতেছিল তাহাই হইল। অতঃপর নিত্যরূপদের বাড়ীতে মুখ দেখাইবার কোনো উপায় রহিল না। বন্ধু হইয়া সে তাহাদের যে ক্ষতি করিল, এত বড় ক্ষতি শত্রুতেও করিতে পারে না।

নিজের পিতাকে সে চেনে। শাস্তি দিতে তাঁহার মতো নিষ্ঠুর আর কেহই নাই। কথাটা তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে কি না কে জানে। পৌঁছিলে আর তাহার নিস্তার নাই। জীবনে তিনি আর কখনও পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন না। মায়ের কাছে ক্ষমা হয় তো দুষ্প্রাপ্য হইবে না। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? তাহার নিজের দিক হইতে সে কি করিয়া মাকে মুখ দেখাইবে?

নিজের মনের অগোচরে তো কিছুই নাই। বহু আশা মনে লইয়াই সে বাড়ী আসিয়াছিল। তার কিছুই সফল হইল না। বোধ করি কোথাও একটা কিছু ঘটিয়াছে। মা নিজে হইতে এ বিষয়ে তাহার মতামত চাহিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে আর উচ্চ বাচ্য করিতেছেন না। নিত্যরূপ তাহার সঙ্গে দেখা করিল। নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। কিন্তু সেও এ সম্বন্ধে একটা কথাও কহিল না। হয় তো এ প্রস্তাবটা মধ্যপথে ভাঙিয়া গিয়াছে। সম্ভবত তাহার পত্র পাওয়ার পরেই উভয় পক্ষ আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে নাই। কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

কিছুদিন হইতে এই আশঙ্কাই তাহার মনের মধ্যে দানা বাঁধিতেছিল। সেই জন্য কাজলীর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ অত বেশী হইয়াছিল। সে যদি সম্মতি দেয় তাহা হইলে আবার নূতন করিয়া কথাটা উঠিতে কতক্ষণ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাজলীর মনের কথাটাই কিছুতে বুঝিতে পারিল না।

সে কাছে আসে। মনে হয় ধরা দিবে। কিন্তু ধরিতে গেলেই পালাইয়া যায়। এই এক খেলা!

বাহিরে যেন কাহার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মা বোধ হয়। বিষ্ণুরথের বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একখানি বই খুলিবার জন্য হাত বাড়াইল। একখানি বইও নাই। আসিবার সময় যা দুই একখানি পাঠ্য পুস্তক আনিয়াছে তাহাও আর খোলা হয় নাই। বাক্সের মধ্যেই বন্ধ আছে।

—এই যে বিষ্টু! ও ঠাকুর, বিষ্টুবাবুর খাবার এইখানে নিয়ে এস। ঝি, এইখানে একটা জায়গা ক'রে দে তো।

মা চলিয়া গেলেন। অত্যন্ত সন্তর্পণে বিষ্ণুরথ নিশ্বাস ফেলিয়া হাল্কা হইল।

স্বামীর খাওয়ার সময় কাছে বসিতে গিয়াই বিষ্ণুরথের জননী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

অপ্রস্তুতভাবে মুখ তুলিয়া ত্রৈলোক্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি?

আঁচল দিয়া যেন হাসিটা মুছিয়া লইয়া গৃহিণী বলিলেন, কিছু নয়। ও ঠাকুর, তরকারিটার অমন রং হ'ল কেন? হলুদ দাও নি নাকি?

ঠাকুর গুণ্ গুণ্ করিয়া কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে দিতে চলিয়া গেল। গৃহিণী ভালো করিয়া বসিয়া স্বামীর মুখের পানে আর একবার চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিলেন।

বলিলেন, বাপু, কাল-পরশুর মধ্যে আশীর্ব্বাদের দিন আছে কিনা দেখ। আর দেরী করা ভালো দেখাচ্ছে না।

পত্নীর অধৈর্য্য দেখিয়া ত্রৈলোক্যবাবু মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন, এত দিন ভালো দেখাচ্ছিল, আজকেই হঠাৎ খারাপ দেখাচ্ছে? এত তাড়া?

—তাড়াই বটে। শেষে কি ছেলে কোলে ক'রে বৌ এসে বাড়ী ঢুকবে? কলিকালে সবই সম্ভব।

ত্রৈলোক্যবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিলেন।

—তার মানে?

এই কথা বলিবার জন্যই গৃহিণীর এত ভণিতা করা। সলজ্জ মধুর ভঙ্গিতে আর একবার হাসিয়া বলিলেন, কে জানে বাপু, আজকে ওদের দু'জনকে নাকি আমাদের বাগানে করবী গাছগুলোর আড়ালে···

গৃহিণী কথা শেষ করিতে পারিলেন না, মুখে আঁচল চাপা দিলেন। একটু পরে কহিলেন, হয়তো রোজই দু'জনে দেখা হয়। কলিকালের ছেলে-মেয়ে। বিশ্বাস তো নেই।

ত্রৈলোক্যবাবু শুধু বলিলেন, হুঁ।

মনে হইল, তিনি যেন একটু বিরক্ত হইয়াছেন। সেকালের লোক। একালের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে পরিচয় কম। তাঁহারা দেখিয়াছেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রকাশ্য ভাবে ঘেমটাওয়ালীর সঙ্গে ইয়ার্কি দিতেছেন। চরিত্রও সকলের অকলঙ্ক নয়। সে সব মার্জ্জনা করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত। কিন্তু স্ত্রী সম্বন্ধে অসংযম প্রকাশ তাঁহাদের কাছে অমার্জ্জনীয়।

ত্রৈলোক্যবাবু এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া আহারান্তে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী এমন চমৎকার প্রসঙ্গের এই প্রকার অপমৃত্যু দেখিয়া মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই তিনি নিত্যরূপের জননীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উভয়ের মধ্যে দেখা হওয়ামাত্র এমন একরূপ মধুর হাসির

বিনিময় হইল যাহার অর্থ কেবল তাঁহারা দুজনেই বুঝিলেন। পুত্র-কন্যার সম্বন্ধে হইলেও নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া দুজনে বেশ রস জমাইয়া তুলিলেন।

নিত্যরূপের জননী হাসিয়া বলিলেন, শুনেছ তো ভাই?

—শুনিছি।—বলিয়া তেমনি মধুর হাসিয়া বিষ্ণুরথের জননী তাঁহাকে পরম সমাদরে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইলেন। পুত্র-কন্যার এবম্বিধ আচরণে কাহারও মনে যে কোনো লজ্জা বা গ্লানি আছে বলিয়া মনে হইল না। ছেলে-মেয়ের প্রেম সম্বন্ধীয় দুর্ব্বলতা মেয়েরা বোধ করি অতি সহজে ক্ষমা করিতে পারে।

—বিষ্টু তো কাল থেকে আর ঘরের বার হয় নি। আমিও ভাই ওর কাছে যেতে পারছি না। ভয় হচ্ছে ওর সামনেই বুঝি হেসে ফেলব। বেচারা ভারী লজ্জা পেয়েছে।

নিত্যরূপের জননী চোখে কটাক্ষ এবং ঠোঁটে হাসি হানিয়া ঝঙ্কার দিলেন, আহা, কি লজ্জা! লজ্জা থাকলে আর রাস্তার ওপর....

বিষ্ণুরথের জননী সরিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন। গলা নীচু করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ দিদি, সবই কি সত্যি?

—সত্যি বই কি। লোকে কি আর মিছামিছি কলঙ্ক রটাচ্ছে?—নিত্যরূপের জননীও গলা নীচু করিয়া উত্তর দিলেন।—যা রটে তার কিছু বটে।

—হয়তো রোজই ওদের ওই জায়গায় দেখা হয়।

—হয় বই কি। অন্যদিন লোকের চোখে পড়েনি, কাল পড়েছে।

বিষ্ণুরথের জননী গালে হাত দিয়া আশ্চর্য্যসূচক ভঙ্গি করিলেন।

—আমাদের সময়ে হ'লে কি হ'ত ভাই? বাপ-মা ছাইএর গাদায় ফেলে কুচি কুচি ক'রে কেটে ফেলতেন। না কি বল?

কিছুকাল স্বামীর সঙ্গে বাহিরে থাকায় হাল আইন সম্বন্ধে নিত্যরূপের

যায় নাই। বাবার সঙ্গে তো তাহার কমই দেখা হয়। মায়ের সঙ্গে কাল সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে দেখা হয়তো হইয়া থাকিবে, কিন্তু কথা একটাও হয় নাই। তিনি আশীর্ব্বাদের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুরথের ধারণা শুধু রাগ করিয়াই তিনি এদিকে আসেন নাই। সেও যে হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহা নয়। বরং না আসায় অনেক লজ্জার হাত হইতে সে বাঁচিয়াই গিয়াছে। তবু যেন কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না যে, তিনি কাল একবারও তাহার এদিকে আসেন নাই। কথাটা মনে হইতেই তাহার শরীর আবার বিছানায় এলাইয়া পড়িল। এমন সুন্দর প্রভাত অনুপম বর্ণ ও গন্ধ লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল।

বিষ্ণুরথ চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে অলসভাবে পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে মা ঝড়ের মতো অকস্মাৎ ঘরে প্রবেশ করিলেন।

—ও মা, তোর এখনও ঘুম ভাঙে নি? বেলা কত হ'ল তার হিসেব আছে?

বলিয়া সম্ভবত লজ্জাবশেই কোনো দিকে না চাহিয়া টেবিলের উপর টুকিটাকি জিনিষগুলি গুছাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুরথও কোনো দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন মা চলিয়া গিয়াছেন। চাকর কোঁচা ধুতি ও চাদর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—ও আবার কি?

চাকরটা নতমুখে একটুখানি হাসি গোপন করিয়া বলিল, বাবু বললেন, জামা-কাপড় প'রে আপনাকে একবার বাইরে আসতে।

এরূপ অদ্ভুত আদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষ্ণুরথ বিস্মিত ভাবে একবার তাহার আনত মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু ভৃত্যের

সঙ্গে এ বিষয়ে আর বাক্যব্যয় করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে নীরবে কাপড় জামা পরিধান করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মনে হইল, বাহিরের মস্ত বড় বালাখানা যেন কোনো আড়ম্বর না করিয়াও একটু বিশেষভাবে সাজানো হইয়াছে। পুরাতন সতরঞ্চিটার উপরে বড় চাদরখানা পাতা। তাকিয়াগুলার অড় বদলানো হইয়াছে। ঘরটাও যেন ঝাড়া ঝোড়া হইয়াছে।

মধ্যে ত্রৈলোক্যবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতে ছিলেন। তাঁহার সুমুখে ডান পাশের দিকে নিত্যরূপ এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া ছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, এই যে বাবাজি, এইখানে বোসো।

বলিয়া একটা বিশেষ জায়গা দেখাইয়া দিলেন।

অনেকগুলি সম্ভব এবং অসম্ভব কার্য্যপরম্পরার ঘাত প্রতিঘাতে বিষ্ণুরথের বোধশক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল। সে বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিল। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই সম্মুখের একখানা রেকাবিতে ধানদূর্ব্বা ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানি আর একটু আগাইয়া দিয়া বলিলেন, তাহ'লে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? অনুমতি করুন।

ত্রৈলোক্যবাবু অনুমতি দিলেন কিনা বোঝা গেল না। বোধ করি ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত দিয়া থাকিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধান-দূর্ব্বা দিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর নিত্যরূপ একসেট সোনার বোতাম এবং আরও কি কি দিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিল, তাহা বিষ্ণুরথ চোখ মেলিয়া দেখিলও না। কলের পুতুলের মতো সকলকে প্রণাম করিয়া আবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

১০

আশ্বিন এবং কার্ত্তিক দুইটা মাস একটার পর একটা পূজার ধূমে গেল। অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিবাহের দিন। শুভদিনে এবং শুভলগ্নে বিষ্ণুরথের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল।

আরও একটি সুঘটনা ঘটিল। পূজার ছুটির পরে কলেজ খুলিতেই পশ্চিমের যে কলেজে নিত্যরূপের পিতা অধ্যাপনা করিতেন সেই কলেজ হইতে তাহার নিয়োগপত্র আসিল। ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে এই কয়টা দিন দেরী হইয়া গেল। বিবাহের গোলমাল মিটিতেই পশ্চিমে চলিয়া গেল।

বিষ্ণুরথের শরীর তখনও সারে নাই। পূজার পরে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়ার কথা বিবাহের জন্য স্থগিত ছিল। বিবাহের পর জননী ও বধূকে সঙ্গে করিয়া সে হাজারিবাগ চলিয়া গেল। একই দিনে সকলে মিলিয়া যাত্রা করিল। কর্ম্মস্থান নূতন হইলেও নিত্যরূপের কাছে অপরিচিত নয়। সেখানে তাহার বহু পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-প্রতিম ব্যক্তি আছেন। সেজন্য গ্রামের বাড়িতে জননীকে একা ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়ার আর আবশ্যক হইল না। তিনিও সঙ্গেই চলিলেন। একটা বাসা ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য নিত্যরূপ আগেই পত্র দিয়াছিল। বাসাও ঠিক করা হইয়াছে। তাহাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কারণ নাই।

হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে বিষ্ণুরথ, তাহার জননী ও কাজলী নামিয়া পড়িল। নিত্যরূপ ও তাহার জননী সেই ট্রেনেই চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুরথের জননী তাহাদের দুইজনকে হাজারিবাগে কয়েক দিন থাকিয়া

যাইবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এমনিতেই কাজে যোগ দিতে নিত্যরূপের এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল যে আর একটা দিনও দেরী করিবার উপায় ছিল না। তবে কথা দিয়া গেল যে, স্থানটি যদি বিষ্ণুরথের ভালো লাগে এবং বড় দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে ছুটির সময়ে সে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। আর যদি ততদিন পর্য্যন্ত থাকিতে ভালো না লাগে, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া যেন একবার নিত্যরূপের ওখান হইয়া আসে।

তবে স্থানটি বিষ্ণুরথের ভালো না লাগিবার কোনো কারণ নাই। স্টেশনের অনতিদূরে একখানি গাঢ় নীল রঙের ছোট বাড়ী, নীল আকাশের পটভূমিকায় সজল মেঘের মতো দাঁড়াইয়া। দূরে দূরে নীল গিরিশ্রেণী আকাশের গায়ে মিশিয়াও মিশিয়া যায় নাই। পাশেই শালের জঙ্গল ক্রমে উঁচু হইয়া পাহাড়ের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। ভাড়া একটু বেশী হইয়াছে। তা হউক, এমন চমৎকার স্থানে এমন সুন্দর ছবির মতো একখানি বাড়ী ত্ব'টাকা বেশী ভাড়া দিয়াও লওয়া যায়।

ত্রৈলোক্যবাবু ইঁহাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। একে তো সহজে তিনি বাহিরে যাইতে চাহেন না, তাহাতে সম্মুখে পৌষ কিস্তি। সুতরাং কৈফিয়তের অভাব হইল না। গৃহিণী বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন, লাটের টাকা পাঠানো হইয়া গেলে তিনি বরং দিন কয়েকের জন্য একবার যাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইহা যে নিতান্তই একটা স্তোকবাক্য, সে কথা ত্রৈলোক্যবাবুকে যাহারা জানে তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

নিজের গ্রামে ত্রৈলোক্যবাবু সিংহসদৃশ। গ্রামের মধ্যদিয়া হাঁটিয়া গেলে ত্ব'ধারের লোক তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রবল প্রতাপান্বিত ত্রৈলোক্যবাবু যেই গ্রামের সীমানার বাহিরে গিয়া পড়েন, অমনি নিজেকে

অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ দাঁড়ানো দূরে থাক, ছোট ছোট ছেলেরাও তাঁহার মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িয়া দেয়। অত্যন্ত মলিনবস্ত্র পরিহিত লোকও তাড়াতাড়িতে তাঁহার পা মাড়াইয়া চলিয়া গেলেও বলিবার কিছু নাই। এমন কি ফেরীওয়ালারা পর্য্যন্ত একবারের উপর দু'বার দর করিলে রসিকতা করিয়া উত্তর দেয়। সবই নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। তিনি এমন কিছু রাজা মহারাজা নন যে, তক্‌মা-আঁটা দু-দশ জন বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া চলিবেন। আর এ তাঁহার জমিদারীও নয়।

শুধু তাই নয়। বাহিরের ভদ্রলোকেরাও যেন কি রকম করিয়া কথা কন। একে তো তাহাদের কথায় বারো আনা ইংরেজি, তার উপর *অন্য স্তরের। গয়া কংগ্রেসে কি কি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে,* কাউন্সিলে *যাওয়া ভালো কি মন্দ, এ সম্বন্ধে দেশবন্ধুই বা কি বলেন আর মহাত্মাজিই* বা কি বলেন, জাপানে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কি বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন এই সব আলোচনা করিয়া শহরের ভদ্রলোকেরা যে কি আনন্দ পাইতে পারেন তাহা তিনি কল্পনাতেও আনিতে পারেন না। জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠিলে যে অবস্থা হয় তাহারও সেই অবস্থা হয়। তাঁহার জমিদারী অহঙ্কার পদে-পদে আহত হয়। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়। সেজন্য নিতান্ত বিপাকে না পড়িলে তিনি বাহিরে যাইতে চাহেন না।

তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাজলী যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই শাশুড়ী ও স্বামীর সঙ্গে বাস করিবে, তাহার মাও যে এ বিষয়ে অনায়াসে সম্মতি দিবেন, বিষ্ণুরথও এমন আশা করিতে পারে নাই, তাহার মাও না। নিতান্ত একবার বলিতে হয় তাই তাহার মা কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, রোগা ছেলে নিয়ে বাইরে থাকব যেখান, ইচ্ছে ছিল বৌমাও আমাদের সঙ্গে থাকেন। তা....

এইটুকুতেই বেয়ান সানন্দে সম্মত হইয়া গেলেন।

—ও মা, সে আবার বলতে হয়! রোগা স্বামীকে ফেলে কাজলী আমাদের সঙ্গে যাবেই বা কেন? কচি মেয়েটিতো নয়। আর তোমাদের বৌকে তোমাদের বিনা অনুমতিতে অত দূরে নিয়েই বা যাব কেন? তা কি পারি? আর আমাদের অধিকার কি?

বলিয়া বেয়ান একটুখানি হাসিলেন। তিনি যদি না হাসিয়া কাঁদিতেন, অন্তত পক্ষে চোখে আঁচলও দিতেন, তাহা হইলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত। কিন্তু তিনি হাসিলেন।

তখন বিষ্ণুরথের জননীকে বলিতেই হইল, কি জানি ভাই, পাছে তোমরা ভাব এখন থেকেই বৌএর ওপর জোর খাটাচ্ছি, তাই এতদিন কথাটা বলি-বলি ক'রেও বলতে পারি নি। পাছে তোমরা মনে দুঃখ কর।

তালুতে জিহ্বা দিয়া এক প্রকার শব্দ করিয়া বেয়ান বলিলেন, আর আমাদের দুঃখ করা বেয়ান! আর কি সে কাল আছে! ক'দিন থেকেই দেখছি মেয়েটা মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের মেয়েকে তো চিনি!

বলিয়া আর একবার হাসিলেন।

এ খবরটা যখন বিষ্ণুরথের কাছে পৌঁছিল সে যে আনন্দে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া মনে হইল বায়ু পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া বুঝি এইখান হইতেই আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহার মা এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কোনো কথা না বলুন, সে নিজে কাজলীর মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এবং কাজলী তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় যাইবে না বলিয়া জানাইয়াছিল। সেই মেয়ে যে স্বামীর সঙ্গে যাইতে না পারার

দুঃখে মুখ শুকাইয়া বেড়ায়, তাহা চিন্তা করার মধ্যে আনন্দও যেমন অপরিচিত, বিস্ময়ও তেমনি বিপুল। ওইটুকু একটি মেয়ে, কিন্তু তাহাকে কিছুতে যেন শেষ পর্যন্ত বোঝা যাইতেছে না। সে বলে এক, করে আর। অথচ এই সুন্দর অসামঞ্জস্য কখনই বিসদৃশও মনে হয় না।

ইহারই মধ্যে বেশ শীত পড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বদিকের বারান্দায় এক ফালি রোদ আসিয়াছে। সকাল বেলায় একখানা র‍্যাপার গায়ে দিয়া কাজলী সেইখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল। মন তাহার ভালো ছিল না। কখনও মা ছাড়িয়া থাকে নাই। মায়ের জন্য তাহার মন অসুখ করিতেছিল। মা ছাড়িয়া থাকিতে যে এত কষ্ট হইতে পারে তাহা সে ভাবে নাই। সকালে উঠিয়া মায়ের মুখখানি দেখিতে না পাইয়া তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিষ্ণুরথ কোথায় কি পাওয়া যায় না যায় দেখিবার জন্য চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার জননী রান্নাঘরে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। আজিকার মতো সেঁ ভে কাজ সারিবার জন্য বিষ্ণুরথ বলিয়াছিল। কিন্তু মা কিছুতেই জ হইলেন না। কলের ব্যাপারে তাঁহার হাত খোলে না। সুতরাং উনান একটা পাতা চাই।

স্টেশনের ওধারে বাজার বলিয়া যাহা আছে তাহাতে মোটামুটি জিনিস পাওয়া যায়। সখ মিটাইয়া বাজার করিবার মতো নয়। বেলা নয়টার সময় বিষ্ণুরথ চাকরের মাথায় কতকগুলা জিনিস আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার শ্রী-ছাঁদ দেখিয়া মা গালে হাত দিলেন।

—এই ? আর কিছু পাওয়া গেল না ?

মেজেতে ধপ্ করিয়া বসিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, অতি হতভাগা বাজার মা, এ ছাড়া আর কিছু পাবার উপায় নেই। এখানে দেখছি শুধু হাওয়া খেয়েই থাকতে হবে।

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাজলী মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া একটা থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ওমা, মাছ কই রে ? মাছও পাওয়া যায় না বুঝি !

বিষ্ণুরথ তখন থামের অন্তরালবর্ত্তিনীকে ইঙ্গিতে কি একটা বলিতে যাইতেছিল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া লইয়া বলিল, তবে আর বলছি কি মা, অতি হতভাগা জায়গা ! তবে মাংসটা নাকি প্রায়ই পাওয়া যায়। আর দুধ-ঘিটা সস্তা। সুসংবাদের মধ্যে এইটুকুই সংগ্রহ করলাম।

মা হাসিয়া বলিলেন, তবেই এখানে থাকা হয়েছে ! তোর যে মাছ নইলে একটা দিনও চলে না। ওরে কেষ্ট, বাবা, তরকারীর ঝাঁকাটা ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়ে রাখগে। আমার এই উনোনের ঝঞ্ঝাটটা মিটলেই যাচ্ছি। ও বৌমা, বিষ্টুকে খাবার দাও। ও তো খেয়েও যায় নি। আমারও যে কখন রান্না হবে তার ঠিক নেই।

শোবার ঘরের মেঝেয় জল খাবারের জায়গা করিয়া কাজলী দ্বার হইতে ইঙ্গিতে বিষ্ণুরথকে ডাকিল। বিষ্ণুরথ চাহিয়া দেখিল তাহার চির পরিচিত ভ্রূকুটিকুটিল, পরিহাসচপল মুখখানিতে একটা অনির্ব্বচনীয়, স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। এ যেন সেই অতি দুরন্ত মেয়েই নয়। সে মুখ দেখিয়া বিষ্ণুরথ রসিকতার চেষ্টা না করিয়া নিঃশব্দে জলযোগে বসিল।

—আর এক বাটি চা এনে দোব ?

বিষ্ণুরথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

—না কেন? যা শীত!

এবার বিষ্ণুরথ হাসিল। বলিল, শীত বটে। চা এক বাটি হ'লে ভালোও হয়। কিন্তু তুমি যে রকম গম্ভীর হ'য়ে কথা বলছ তাতে চা কেন, অমৃতের তৃষ্ণাও লোপ পেয়ে যায়।

উত্তরে কাজলী শুধু পাতলা একটুখানি হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। এত শীতে আর এক বাটি চায়ের প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া সে পূর্ব্ব হইতে স্টোভে জল বসাইয়া দিয়াছিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এক বাটি চা আনিয়া বিষ্ণুরথের সম্মুখে রাখিয়া অনতিদূরে মেঝের উপর বসিল। এত তাড়াতাড়িতে চা আনায় বিষ্ণুরথ বিস্মিত হইল।

বলিল, এরই মধ্যে? আজকাল কি জল গরম করতে হচ্ছে না?

ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া হাসিয়া কাজলী বলিল, উঁহু। চা ফেলে দিলেই জল গরম্ হ'য়ে যাচ্ছে।

মাথা নাড়িয়া বিষ্ণুরথ বলিল, ভালো, ভালো। চায়ের দোকানের ঠিকানাটা আমাকে দিও তো। এমন গুণ শুনলে হু হু ক'রে কাটবে।

—দেবো, আগে মিষ্টিটা খেয়ে নাও দিকি।

—পাগল! জলযোগটা কি সোজা জলযোগ হ'ল?

—খাবে না?

—অসম্ভব।

—খাবে না? আচ্ছা!

দেখিতে দেখিতে কাজলীর বড় বড় চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু-কণা জমিল। এবং বড় বড় দু'ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গাল বহিয়া মেঝেয় পড়িল। সে বুঝি কাঁদিবার একটু উপলক্ষ খুঁজিতেছিল! নইলে এত সহজে নাকি আবার কাঁদিতে পারে!

বিষ্ণুরথ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। টপ্ করিয়া সন্দেশটা মুখের মধ্যে পুরিয়া কোনো প্রকারে বলিল, ও কি! ও কি! কাঁদ কেন?

আর কাঁদ কেন!

বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি এক চুমুক চা খাইয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কাজলীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কেবল উঠিতে যাইবে এমন সময় কাজলী মুখে আঁচল চাপা দিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে ও ঘরে পলাইয়া গেল। বিষ্ণুরথ অবাক! কই সে তো কাজলীকে এমন কোনো কড়া কথাই বলে নাই।

অল্পদিন পূর্ব্বে এ বাড়ীটায় বোধ করি কেহ দীর্ঘ দিন ছিলেন। বারান্দায় দেওয়ালের এক কোণে পেন্সিলে অনেক হিজি বিজি কাটা আছে। মাথার উপরের ছবিটা হয় গাধার, নয় ঘোড়ার। গরুরও হইতে পারে। নীচে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে র মা দি দি র ব র। লেখা এবং ছবি দুইটিরই উপর হাত দিয়া মুছিয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, নূতন করিয়া চূনকাম করার পরও সে চিহ্ন যায় নাই। এখানে-ওখানে বহু জায়গায় আরও যে কত লোকের, পুরুষ ও নারীর, নাম খড়িতে কাঠ-কয়লায় এবং পেন্সিলে লেখা আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত অপরিচিত নাম বার বার পড়িতে পড়িতে মন একটি রমণীয় মোহে হাল্কা হইয়া ওঠে; তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করিবার জন্য লোভার্ত্ত হয়।

পিছনে বাড়ীর সংলগ্ন ঘেরা জায়গায় যে কয়টা বড় বড় শাল ও আমলকীর গাছ আছে সেগুলা হয়তো অযত্নবর্দ্ধিত, কিন্তু কতকগুলা ফুলগাছও একদা লাগানো হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আছে। কতক

গুলা মরিয়া গিয়াছে। কোথাও শুষ্ক কাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও তাও নাই। কতকগুলা নানা প্রতিকূল অবস্থাতেও এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বাঙালী বাসাবাড়ীতে সহজে ফুলবাগান করিতে চায় না। ভাবে কয়দিনের জন্য কেনই বা এত! সেই জন্যই মনে হয় অল্প দিন পূর্ব্বে কেহ এখানে দীর্ঘ দিন ছিলেন। হয়তো বাড়ীর মালিক নিজেই ছিলেন। নহিলে ভাড়াটে বাড়ীতে সহজে ফুলবাগান হয় না।

সেদিক হইতে এক চক্র ঘুরিয়া আসিয়া বিষ্ণুরথের খেয়াল হইল, যে কয়টা মাস এখানে আছে বাগানটাকে ভালো করিতে হইবে। চারিদিকে কাঁটা-তারের বেড়া ঠিকই আছে। কোথাও এক আধটা খুঁটি হয়তো নড়বড় করিতেছে। সে কিছুই নয়। কাজলী সুদ্ধ সঙ্গে থাকিলে এই উপলক্ষ্যে কয়টা দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইবে। সে কাজলীকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শীতের দিনে দশটা বেলা কিছুই নয়; রান্নারও বহু বিলম্ব। এতটা সময় করাই বা যায় কি?

কিন্তু কাজলী তখনও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে দেওয়ালে ঠেস দিয়া হাঁটুর ফাঁকে একখানা ইংরেজি ব্যাকরণ রাখিয়া মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করিতেছিল।

বিব্রতভাবে বলিল, বা রে বাঃ! আমি পড়ছি যে!

এক ফুঁয়ে তাহার কথাটা উড়াইয়া দিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, ওঃ! ভারি পড়া! আমার এম-এ'র পড়া বন্ধ রয়েছে, আর যত চাড় তোমার।

—তা, তুমি যদি এখন পড়াশুনো ছেড়ে দাও। তাই ব'লে আমিও পড়া বন্ধ রাখব?

—না তো কি! বিয়ে হ'য়ে গেলে আবার মেয়েরা পড়ে না কি?

পড়াটা কেবল কুমারী মেয়েদের আর বিধবাদের জন্যে,—যাদের খেটে খাবার আশঙ্কা আছে।

কাজলী বইটা মুড়িয়া রাখিয়া তর্ক করিবার জন্য ভালো করিয়া বসিল। বলিল, তাই বুঝি? তবে এত মেয়ে পড়ে কেন?

—পড়ে, যদি বিয়ে না হয় তাহ'লে চাকরী ক'রে খেতে হবে তো। সেই জন্যে। ছেলে তো আর গাছের ফল নয় যে পেড়ে আনলেই হবে।

কাজলী একটা বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল, কখনও পাড়তেও হয় না। জানলে? আপনাথেকেই কোলের কাছে টুপ্ ক'রে পড়ে।

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, সে যেখানে মেয়ের খুব তপস্যার জোর থাকে। নইলে মেয়ের বাপকে পাত্র জোগাড় করতে হিম্‌সিম খেতে হয়। কাজেই বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের আইবুড়ী থাকতে হয়। তখন আর উপায় কি? ব'সে না থাকি বেগার খাটি। মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে আরম্ভ করলে।

—তাই নাকি?

—আবার কি! এও দেখবে, সুন্দরী মেয়েরা কখ্‌খনো পড়াশুনো নিয়ে মাথা ঘামায় না। জানে তাদের একটা হিল্লে রূপের জোরে হবেই। খাটে যাদের রূপের বালাই নেই। হয় গান শেখে, নয় পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। একটা কিছু চাই তো, নইলে বিকোবে কি ক'রে? সাফ্রেজিষ্ট্‌রা যাই বলুক আর যাই লিখুক, আসলে মেয়েরা পণ্যধর্ম্মী।

কাজলী দেখিল তর্কে বড় সুবিধা হইবে না। ও একেবারে গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছে। সে আবার তাহার ইংরেজী ব্যাকরণখানা খুলিয়া তাহাতে অখণ্ড মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিয়া নিতান্ত নিস্পৃহভাবে বলিল, তারপর?

—তারপর আর নেই। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত সেই এক

খেলাই চলেছে। সেকালের অসভ্য মানবীরাও তাই করে এসেছে, একালের সুসভ্য শিক্ষিতা মহিলারাও তাই করছেন। আমি এমনও দেখেছি, বিলেতফেরং মেয়ে, ভালো চাকরী করতেন। বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরী ছেড়ে দিয়ে অম্লানবদনে স্বামীর স্কন্ধে আরোহণ করলেন। যেন পরিবার প্রতিপালনের সকল দায়িত্বই বেচারা স্বামীদের। মেয়েদের শুধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং-বেরঙের কাপড় প'রে প্রজাপতির মতো পাখ্না মেলে বেড়ালেই চলে।

—চলেই তো স্ত্রীপুত্রকে খেতে দেবার শক্তি যার নেই, সে বিয়ে করবে কেন? মেয়েরা বিয়ে করার পর রোজগার করতে যাবে কোন দুঃখে?

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, তা যদি নাই যাবে তবে আর অসময়ে বই প'ড়ে প'ড়ে শরীর নষ্ট ক'রে লাভ? ওর চেয়ে বাগানে খানিকটা ক'রে জল দিলে ঢের ভাল হবে। ওঠ।

কাজলী উঠিবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল, শরীর নষ্ট করি কি সাধে? তুমি যদি পরে আমাকে খেতে না দাও, যদি ভালো না বাস, সেদিনের ব্যবস্থা তো এখনই ক'রে রাখতে হবে? Make hay while the sun shines.

বিষ্ণুরথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, তারও ভয় নেই। হিন্দুদের বিয়ের এমনি মজা যে একবার জোড়া লাগলে আর ভাঙে না। ভালো যদি নাও বাসি, খেতে দিতে হবেই। এমনিতে না দিই আদালতে গিয়েও দিতে হবে। ওঠ।

কাজলী তথাপি উঠিল না। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

বিষ্ণুরথ আরও কাছে ঘেঁসিয়া বলিল, আমরা এখানে পরীক্ষার

পড়া তৈরী করতে আসি নি কাজলী। আমার বাক্স খুলে দেখ, খানকয়েক বাজে নভেল ছাড়া আর কিছু আনি নি। তুমি আবার কি করতে যে পড়ার বই নিয়ে এলে....

কাজলী বইখানা সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিল, বাবা, বাবাঃ! চল তোমার কি মজুরী খাটতে হবে দেখি গে।

বিষ্ণুরথ তাহার কানের কাছে চুপি চুপি বলিল, মজুরী নয় মুজ্‌রো। বুঝলে?

কাজলী নয়নে একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল, মুজ্‌রো? তাহ'লে তো পেশোয়াজ প'রে আসতে হয়।

বিষ্ণুরথ তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিয়া বলিল, না, না, কিছু দরকার নেই। এই সাজেই হবে।

কাজলী চলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল, না ছিঃ! মা কি মনে করবেন বল তো! অত বেহায়াপনা কি ভালো?

বিষ্ণুরথ তাহাকে টানিতে টানিতে বলিল, এর আর বেহায়াপনা কি? তুমিও যেমন! মা দেখতেই পাবেন না। তাঁর কি আজ ফুরসুৎ আছে? রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আর তারও অনেক দেরী।

কাজলী আর একবার বলিল, না, না, ছিঃ!

কিন্তু বিষ্ণুরথ কিছুতে তাহাকে ছাড়িল না। বাগানের দিকে একরূপ টানিয়াই লইয়া গেল।

কিন্তু বাগানের যে অবস্থা তাহাতে ইহাদের দুইজনের সাধ্য নাই কিছু করে। ঘাসে এবং আগাছায় জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। সেটা আগে পরিষ্কার করা দরকার। বাগান পরিষ্কার করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত

হইয়াও আসে নাই। কোনো প্রকার যন্ত্রপাতিও সঙ্গে আনে নাই। আশার কথার মধ্যে কেবল এইটুকু যে ইঁদারাটা সুসংস্কৃতই আছে। এ বাড়ীতে কেহ না থাকিলেও বোধ হয় সেটার ব্যবহার হইত।

কাজ করিতে নামিয়া বিষ্ণুরথ উপলব্ধি করিল, এ তাহাদের কর্ম্ম নয়। কিন্তু দমিল না। একটা আমলকী গাছের তলায় রুমাল পাতিয়া কাজলীকে সেখানে বসাইয়া রাস্তা হইতে একদল কুলী ধরিয়া আনিল। লোকগুলা দেখিতে যেমন শক্ত সমর্থ, কাজও করে তেমনি নিরেট। দেশের মজুরদের মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খাইবার অছিলায় সময় হরণ করে না। দরদস্তুর করিতেও তাহাদের মতো পাকা নয়। অতি সামান্য মজুরি হাঁকিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়া গেল।

লোকগুলাকে কাজে লাগাইয়া বিষ্ণুরথ আসিয়া কাজলীর পাশে বসিল। তাহার মুখে একটি চমৎকার পরিতৃপ্তির হাসি। তাহার দেহ মন একটি সুন্দর অহঙ্কারে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। এতগুলি লোক তাহার হুকুমে আসিল, তাহার হুকুমে কাজে লাগিল,—কাজলী স্বচক্ষে তাহা দেখিল। স্বচক্ষে দেখিল, এ বাড়ীর সে কর্ত্তা। এখানে সমস্ত কাজ তাহার হুকুমে হইবে। বিষ্ণুরথের মনে হইল, নিজের পৌরুষ চরিতার্থ করিবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম মিলিল।

তাহাদের পিছনেই একটি ছোট পাহাড় আশ্চর্য্য মায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধোঁয়াটে-সবুজ পাহাড়ে কি যে রহস্য আছে, মানুষ একবার চাহিলে আর চোখ ফিরাইতে পারে না। পাহাড় যেন মানুষকে ডাকে, ডাকে, কেবলই ডাকে।

কাজলীরও কি যে হইয়াছে, কিছুতেই বিষ্ণুরথের গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। বিষ্ণুরথ তাহার কাছে আসিতেছে জানিতে পারিয়াই সে পাহাড় দেখিতে লাগিল।

বিষ্ণুরথ তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিল, দূর থেকে পাহাড় দেখতে বেশ লাগে, না?

কাজলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। একটু পরে বলিল, আজ বিকেলে যাবে ওখানে বেড়াতে?

তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুরথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ও কি কাছে ভেবেছ? খুব কম হ'লেও মাইল চারেক দূরে।

কাজলী বিস্মিত ভাবে কহিল, ওমা! ওই তো পাহাড়।

—তাই মনে হচ্ছে বটে। গাছগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পা বাড়ালেই পৌঁছে যাব। পাহাড়ের ওই মজা। পাহাড়ের আর মেয়েদের। মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যাবে, কিন্তু যায় না। পাহাড় আর মেয়ে শুধু দূর থেকে ভোলায়,—ধরা দেয় না।

কথাটা সে পরিহাস করিয়া ব... নাই। তাহার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা গাঢ়তা ছিল। কাজলী তির্য্যক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। একটু দুঃখিতও হইল। কয়দিন হইতেই বিষ্ণুরথ নানা উপলক্ষ্যে তাহাকে খোঁটা দিতেছে। তাহার যে কোথায় ব্যথা তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলে না। সে সমস্ত কথা কাজলী কোথাও ভালো বুঝিতে পারে নাই, কোথাও বুঝিয়াও বোঝে নাই। আজ মনে হইল বিষ্ণুরথের অন্তরে কোথাও একটা স্থানে নিগূঢ় কোনো ব্যথা আছে, যাহা সে স্পষ্ট করিয়া বলিতেও পারে না, না বলিয়াও পারে না।

কাজলী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি যখন-তখন ও খোঁটা আমাকে প্রায়ই দাও কেন? কী তুমি আমার কাছে পাও নি?

দূর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে বিষ্ণুরথ উত্তর করিল, কী যে পাই নি সে আমিও জানি না। কী যে চাই তাও বলতে পারব না।

শুধু এইটুকু বুঝতে পারি যে, তোমাকে পেয়ে আমার দুঃখ ঘোচে নি। ধরা তুমি আজও আমাকে দাও নি।

—ধরা দিই নি?

—না। তোমাকে পেয়েও আমি পাই নি।

কয়টি শুক্‌না পাতা কাজলীর কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। সে কয়টি তুলিয়া লইয়া নখে করিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গাঢ় কণ্ঠে বিক্ষুব্ধ কহিল,—

—কাল রাত্রে কথা কইতে কইতে হঠাৎ কখন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। ঘরে কাচের জানালা দিয়ে অজস্র চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শেষে বাইরে এসে বসলাম। সামনের বনে, দূর পাহাড়ের গায়ে চাঁদের আলো প'ড়ে মনে হচ্ছিল, কিছুই এই বস্তুজগতের যেন নয়। সবই শুধু চোখ মেলে দেখাই যায়,—ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না। কতক্ষণ তাই দেখলাম। সমস্ত শিরা-উপশিরা পর্য্যন্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করছিল। যা বস্তু নয়, মানুষের স্নায়ু তা বোধ করি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না।

স্বামীর দুটি আঙ্গুল লইয়া খেলা করিতে করিতে অনুতপ্ত স্বরে কাজলী কহিল, আমি কিছুই জানি না।

—না, তুমি তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলে। আমি আবার ফিরে এসে তোমার শিয়রের কাছে ব'সলাম। তোমার চুলগুলি নিয়ে কতক্ষণ খেলা করলাম।

—আমাকে ডাকলে না কেন?

—ডাকলাম না। তোমার সেই রাজপুত্র ছেলেটির কথা মনে পড়ল।

রাজপুত্র ছেলের কথা কাজলীর কিছুই মনে নাই। তেমন কোনো

ছেলের কথা কোনোদিন বিষ্ণুরথকে বলিয়াছে বলিয়াও স্মরণ করিতে পারিল না। কহিল, সে আবার কে?

—সেই যে-ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হ'য়েছিল; যে রাজপুত্রের মতো কান্তিমান; তার কথা। মন ভারী হয়ে উঠল। মনে হ'ল তার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনা ভালো হয় নি। তাহ'লে এমন চাঁদনি রাত্রি তোমার ব্যর্থ হ'ত না।

এবারে কাজলী রাগ করিল। বলিল, দেখ, পুরুষমানুষ চিরকাল অন্ধ, শুধু জেলাসিতে নয়,—চোখের দৃষ্টিই মোটা। সূক্ষ্ম জিনিস চোখে পড়ে না। তুমি শুধু মিথ্যে রাজপুত্রের কথাটাই মনে রাখলে, আর আমি যে তোমার জন্যে লোক, লজ্জা, মান, ভয়, আরও কত কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম—সে চোখে পড়ল না? পুরুষ এমনই বটে!

ধমক খাইয়া বিষ্ণুরথ প্রথমটা হতচকিত হইয়া গেল। বলিল, সে রাজপুত্র তো মিথ্যে নয়।

কাজলী হাসিয়া ফেলিল। আঙ্গুলে একটা চাপ দিয়া বলিল, না, মিথ্যে নয়। কারণ সে রাজপুত্র আমার তুমি। আমাকে পাবার জন্যে তুমি যত ব্যাকুল হ'য়েছিলে, তার বহুগুণ ব্যাকুল হ'য়েছিলাম আমি নিজে। আজ বড় দুঃখেই এ কথা আমাকে স্বীকার করতে হ'ল। এমন ক'রে বারে বারে খোঁটা না দিলে, কোনো দিনই তুমি জানতে পারতে না। এ তোমার কাছে স্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু তুমি স্থির ক'রেছ আমার লজ্জা রাখবার এতটুকু ঠাঁইও রাখবে না।

বলিতে বলিতে রাগে, দুঃখে, অভিমানে কাজলী কাঁদিয়া ফেলিল।

কান্না দেখিয়া বিষ্ণুরথ বিব্রত হইয়া উঠিল। বলিল, ওকি, কাঁদছ

কেন? আমি তো তেমন কোনো কথা বলিনি। এতেই কাঁদে? ছিঃ! লক্ষ্মীটি, কাঁদে না।

কাজলী ধীরে ধীরে আপনাকে সম্বরণ করিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মতো স্থির হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। বিষ্ণুরথও আর কোনো কথা বলিল না। কাজলীর যে হাতখানি তাহার কোলের উপর ছিল সেইখানি লইয়া অকারণে খেলা করিতে লাগিল।

একটু পরে কাজলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল ওঠা যাক। মা বোধ হয় খুঁজছেন।

বিষ্ণুরথও উঠিয়া বলিল, হ্যাঁ, চল। কাল থেকে কিন্তু বাগানটি নিয়ে লাগতে হবে। কি বল?

কাজলী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

—আপত্তি করবে না তো?

কাজলী হাসিয়া বলিল, না।

বিবাহের পরেই কাজলীর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ের মতো সে কোনো কালেই নয়। প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, জোরে জোরে ছুটিতে, উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিতে এবং বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে সমানে তর্ক করিতে সহরেও তাহার জুড়ি মেলে না। বর্তমান শ্বশুরালয় তাহার নিকট অপরিচিত নয়। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সে শাশুড়ীকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিয়াছে এবং নিজের মায়ের মতো আব্দার করিয়াছে। তাহার কলকণ্ঠ চীৎকারে ও ছুটাছুটিতে বিষ্ণুরথের বাড়ীর লোকে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণুরথ নিজেও কি কম উৎপাত সহ্য করিয়াছে? সেই কাজলী বিবাহের পর আশ্চর্য্যরূপ শান্ত হইয়া গেল। বর্ষণভূয়িষ্ঠ মেঘের মতো নয়, পুষ্প-স্তবকনম্রা ব্রততীর মতো। আর তাহার কলকণ্ঠ শোনা যায় না, উচ্চহাস্যে প্রতিবেশীরা চকিত হইয়া ওঠে না। যে

বিষ্ণুরথের মায়ের কাছে একদিন তাহার আবদার ও অত্যাচারের অন্ত ছিল না, তাঁহারই পায়ে পায়ে এখন সে অবাঙ্‌মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। এ যেন সে মেয়েই নয়।

বিষ্ণুরথ ভাবে, মেয়েরা অদ্ভুত, মেয়েরা বহুরূপী। যখন যেখানে থাকে তার সঙ্গে আশ্চর্য্যরকম মিশিয়া যায়।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলে, তুমি কি সেই কাজলী?

কাজলীও ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা ক'রে, তোমার কি মনে হয়?

—রাত্রে মনে হয় সেই কাজলীই বটে। কিন্তু দিনের আলোয় দেখে আর চিনতে পারি না। এত লজ্জা কোথায় পেলে? এমন শান্তই বা হ'লে কি ক'রে?

কাজলী রাগ করে না, হাসে। বলে, সেই দণ্ডী রাজার গল্প শোনো নি? রাজা উর্ব্বশীকে পেয়েছিল,—দিনে অশ্বিনী, রাতে উর্ব্বশী। আমরা সবাই তাই। দিনে অশ্বিনী, রাতে উর্ব্বশী। দিনে বইতে হয় বহুলোকের বোঝা, রাত্রে নিজেকে ফিরে পাই। বুঝলে?

কথাটা বিষ্ণুরথের মনে লাগে। একটু ভাবিয়া বলে, তাই হবে। কিন্তু আমার দিন চলে কি ক'রে?

—তোমার আবার ভাবনা? তোমার কত বন্ধুবান্ধব, কত রকমের আমোদ-প্রমোদ, খেলা ধূলো। তোমার দিন তো হাওয়ায় চলে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিষ্ণুরথ কহে, তাই বা চলে যায় কই? এই বিদেশে কোথায় বা পাই বন্ধু-বান্ধব, কোথায় বা পাই আমোদ-প্রমোদ!

তখনই গলা নামাইয়া বলে, কিন্তু তাতেও বোধ হয় দিন কাটতো না কাজলী। তোমার সঙ্গ নইলে এক দণ্ডও আমার কাটবে না। এ যে কী হয়েছে····

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারে না। শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

বিষ্ণুরথের এই কাকুতিতে কাজলীর মন বোধ হয় চঞ্চল হইয়া ওঠে। অনেকক্ষণ সে স্বামীর ব্যথিত মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে। তারপর বুড়ী মেয়ের মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দেখ, বাঙালীর ঘরে বউ নিয়ে অত মাতামাতি করতে নেই। লোকে নিন্দে করে। এই যে যখন-তখন তুমি আমাকে ডাক, একবার পেলে যে আর ছাড়তে চাও না, এতে আমার যে কী লজ্জা করে, সে আর তোমায় কি বলব? এমন হয়েছে যে, তুমি বাড়ী এলেই মা তাড়াতাড়ি আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কাজলী অপাঙ্গে চাহিয়া লজ্জিত ভাবে হাসে।

—আমার এত লজ্জা করে!

বিষ্ণুরথ তাহাকে দুই হাতে আকর্ষণ করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে। পরম স্নেহে মুখে হাত বুলাইয়া বলে,—সেই তো ভালো। লজ্জাও করুক, তুমিও থাক। তোমার লজ্জিত মুখখানি দেখতে আরও ভালো লাগে। কী এত কাজ যে, দিন রাত্তির মায়ের পিছু পিছু ঘোর?

কাজলী নিজকে মুক্ত করিবার চেষ্টা মাত্র করে না। স্বামীর স্নেহ স্পর্শে তাহার দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া আসে। বিষ্ণুরথের মাথার উপর কপোল রাখিয়া মুদিত নেত্রে বলে, কিছু কাজ নেই। তবু ঘুরি, যদি একটা কাজ মেলে।

—কিছু মেলে?

—মেলে বই কি। মাঝে মাঝে কিছু কাজ পাই। কিন্তু সেও অতি সামান্য।

—আজকে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাব ভাবছি। যাবে? তাহ'লে মায়ের কাছে ছুটি চেয়ে নিই তোমার জন্যে।

কাজলী তাড়াতাড়ি বলে, না, না, আজকে না। আজ বিকেলে মায়ের কাছে একটা নতুন রান্না শিখতে হবে।

বিষ্ণুরথ মনে মনে দুঃখিত হয়। রান্না শেখাই এত বড় জিনিস? সে কি আজ না শিখলেই হইবে না? সে রান্না কি মা তাহাদের জীবনে এই একটিবার মাত্র রাঁধিবেন যে, আর কোনো দিন তাহা শিখিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে না? কাজলী ছেলেমানুষ, অকালে বুড়ী হইয়াছে। কিন্তু এত যে লম্বা লম্বা কথা কয়, একথা বুঝিতে পারে না যে, আজিকার এই অপরাহ্ণ জীবনে আর কোনো দিন ফিরিয়া আসিবে না? মাথা খুঁড়িলেও না?

বিষ্ণুরথ মনে দুঃখিত হয়। কিন্তু কিছু বলে না। তাহার আলিঙ্গন শিথিল হয়। সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে। তাহার ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া কাজলীর বুক ফাটিয়া যায়। তবু একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারে না। শাশুড়ীকে সে মনে মনে ভয় করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে শাশুড়ীর পিছনে গিয়া দাঁড়ায়। শাশুড়ী একবার পিছনে চাহিয়া আবার নিজের কাজে মন দেন। কোনো দিন একটা ফরমাস করেন, কোনো দিন করেন না।

কয় দিন হইতে বিষ্ণুরথের মায়ের শরীর ভালো যাইতেছিল না। কিন্তু, মেয়েদের যা দস্তুর, নিজের অসুখের কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করেন নাই। একে তো এদিকে দুরন্ত শীত। এত শীত সহ্য করা তাঁহার অভ্যাস নাই। তাহার উপর গায়ে একটা গরম জামা দেওয়া দূরে থাক, একখানা

আলোয়ান পর্য্যন্ত কিছুতেই গায়ে দিবেন না। আলোয়ান গায়ে দিয়া কাজ করিতে নাকি অসুবিধা হয়। হিন্দুস্থানী বামুনের হাতের অন্ন তিনি গ্রহণ করেন না। দেশের ঠাকুরকেও আনা হয় নাই। কর্ত্তার অসুবিধা হইবে। সুতরাং স্বহস্তেই পাক করেন। একটা চাকর নিতান্ত না রাখিলে নয়, তাই একটা হিন্দুস্থানী ছোকরাকে রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ধোয়া থালা-বাসন দশবার করিয়া নিজেকে জল বুলাইয়া লইতে হয়।

এই সকল নানা কারণে কয় দিন হইতে সর্দ্দি হইয়া তাঁহার শরীর খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে। কিন্তু সে কথা চাপিয়া রাখিয়াই সমস্ত কাজ করিতেছিলেন। আজও করিতেন, কিন্তু কাজলী আজ আর তাঁহাকে কিছুতেই রান্না ঘরে ঢুকিতে দিল না। জোর করিয়া গায়ে একটা আলোয়ানও জড়াইয়া দিল। কিন্তু কিছুতেই শোয়াইয়া রাখিতে পারিল না। গৃহিণী প্রথমে রান্না করিবার জন্য অনেক জেদাজেদি করিলেন। অবশেষে হার মনিয়া হাসিয়া রান্নাঘরের বাহিরের বারান্দায় একখানা আসন পাতিয়া বসিয়া এক সঙ্গে রৌদ্র সেবন ও রান্নার তদারক করিতে লাগিলেন।

কাজলী কোমরে আঁচল জড়াইয়াছে। অবগুণ্ঠনের পাশ দিয়া কালো এলোচুল পিঠের উপর লুটাইতেছে। ব্যস্ততার আর সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে আনন্দে গৃহিণীর চোখ সজল হইয়া উঠিল। বধূনির্ব্বাচনে তাঁহার ভুল হয় নাই তবে। কাজলী ঘর-গৃহস্থালি রাখিতে পারিবে। তাহার কাজ করিবার ব্যবস্থা আছে, হিসাব-জ্ঞান আছে, নিষ্ঠা আছে। ইহার হাতে সংসারের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া আগামী বৎসর স্বামী-স্ত্রীতে তীর্থ ভ্রমণ করা চলিবে। আর রোগ যদি বেশীই হয়, যদি দিন ঘনাইয়াই আসে, বৃদ্ধ স্বামীর ভার ইহার হাতে তুলিয়া দিয়া চোখ বন্ধ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা হইবে না।

তিনি নিজের কথাই ভাবিতেছিলেন। কাজলীর চিন্তা চলিতেছিল অন্য পথে। জীবনে আজ সে প্রথমে স্বামীসেবায় নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি দ্রব্য নিজের হাতে রাঁধিয়া, নিজের হাতে পরিবেশন করিবে। সে কী তৃপ্তি! অন্তরের আনন্দ সে যেন আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

কেমন একটু লজ্জা করে। এত লজ্জা তাহার মতো মেয়ের যে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল কে জানে! বিষ্ণুরথের সম্বন্ধে এখন আর তাহার লজ্জার শেষ নাই। ভাবিতে লজ্জা করে, শাশুড়ীর সামনেই যদি পরিবেশনকালে স্বামীর চোখে চোখ পড়িয়া যায়! অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া সে তো একবার স্বামীর দিকে না চাহিয়া পারিবে না। আর বিষ্ণু যে ছেলে, সে তো ইচ্ছা করিয়াই শুধু তাহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য চোখে চোখ ফেলিবার চেষ্টা করিবে। লজ্জা বলিয়া যদি কিছু তাহার থাকে! এমনিতেই সুযোগ পাইলে কি তাহাকে কম বিপদে ফেলে!

কাজলীর মনের মধুচক্রে বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু জমিতে লাগিল। চাকরকে দিয়া আজ সে ইচ্ছামত বহু জিনিস বাজার হইতে আনিয়াছে। কি জানি, শাশুড়ীকে বিশ্বাস নাই। জ্বর নয়, কিছু নয়, তুরন্ত শীতের জন্য সর্দি। হয়তো বিকালেই ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিবেন, আর তাহাকে রান্নাঘরে আগুনের তাতে যাইতে দিবেন না।

বাজার দেখিয়া গৃহিণী মনে মনে কি বুঝিলেন কে জানে, প্রকাশ্যে ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, অত বাজার কে আনতে বলেছিল? একটা দিন অত বাজার না হ'লে হ'ত না?

কাজলী কুণ্ঠিতভাবে বলিল, ওই রকমই তো রোজ আসে মা।

--আসে, সে আমি ভালো থাকি ব'লে। আজ অত রাঁধবে কে?

তুমি? অত রান্না আমি কিছুতে রাধতে দোবনা। বরং রেখে দাও। ভালো থাকি, রাত্রে হবে।

কাজলী মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, মাংসটা তো থাকবে না।

—আবার মাংসও আনিয়েছ? তোমার যদি কিছু আক্কেল থাকে বাছা। ভাবলাম, দুটো ভাতেভাত হবে, তাই তোমাকে রাধতে দিয়েছিলাম। এত জানলে কিছু তোমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিতাম না।

কাজলী মলিনমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিয়া বোধ হয় গৃহিণীর করুণা জন্মিল। অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিলেন, কিমা-করা মাংসের খানকয়েক কাট্‌লেট্ কর। আর মাংসের ঝোল হোক।

তরকারীগুলির প্রতি চাহিয়া কাজলী অনুনয়ের সুরে কহিল, আর কিই বা রান্না মা, ও আমি খুব পারব। আমার কিছু কষ্ট হবে না!

মা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, যা হয় কর বাছা, কষ্ট না হ'লেই হ'ল।

কাজলী যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

কিন্তু মুখে কিছু না বলিলেও বিষ্ণুরথ মনে মনে চটিয়া গেল। সমস্ত সকালের মধ্যে একবারও কাজলীর দেখা মিলে নাই। অগত্যা সে একাই খানিকটা বাগানে বেড়াইয়া পাশের বাড়ীতে যে নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিবার জন্য বাহির হইল।

অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সৌম্যমূর্ত্তি। মাথার সম্মুখের দিকে টাক। পরণে ইংরেজি পোষাক। একটি ছড়ি হাতে সম্মুখের বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন। বিষ্ণুকে পাইয়া তিনিও বাঁচিলেন, তাঁহার

মেয়েও বাঁচিল। বৃদ্ধ বয়সের যা রোগ, ভদ্রলোক অত্যন্ত বেশী কথা বলেন। একা মেয়ের পক্ষে সকল কথায় মনোযোগ দেওয়া কম পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। বিষ্ণুরথ আসিতেই পিতাকে তাহার কাছে রাখিয়া মেয়েটি ভিতরে চলিয়া গেল।

মিঃ ডাট্‌ বলিলেন, আমার মেয়ে। ওই একটি মাত্রই আমার সন্তান।

বিষ্ণুরথ চাহিয়া দেখিলেন, বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি শীর্ণ মেয়ে। রংটি বেশ ফর্সা। গলায় একগাছি সরু হার, হাতে দুইগাছি করিয়া সরু চুড়ি। পায়ে পাৎলা চটি।

মিঃ ডাট্‌ জোর করিয়া বিষ্ণুরথকে চা খাওয়াইলেন, এবং ঘণ্টা দুই ধরিয়া অনর্গল কি যে বকিয়া গেলেন, বিষ্ণুরথের যে-প্রকার মানসিক অবস্থা তাহাতে তাহার কতক কানে গেল, কতক গেল না।

ফিরিয়া আসিয়া স্নান সারিয়া সে আহারে বসিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না। এমন কি, কাজলী যে প্রকার আশা করিয়াছিল, বিষ্ণুরথ তাহাকে বিব্রত করিবার জন্য সে প্রকার কোনো চেষ্টাই করিল না। কাজলী যে এই প্রথম নিজের হাতে তাহাকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছে, তাহাও যেন চোখে পড়িল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে তো যাচ্ছিস, রান্না কেমন হয়েছে?

বিষ্ণুরথ যেন চমক ভাঙিয়া তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, বেশ হয়েছে। মন্দ হয় নি।

মা হাসিয়া বলিলেন, বেশ হয়েছে, মন্দ হয়নি, সে আবার কিরে? আর দুখানা কাট্‌লেট্‌ দেবে?

—না, না, আর দরকার নেই।

—একটু মাংস?

—কিছু চাই না।

বিষ্ণুরথ খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িল। প্রত্যাশা করিতে লাগিল, তাহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে কাজলীর নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় নাই। এইবার সে অভিমান ভাঙাইতে আসিবে। তাহার চোখে ঘুম আর আসে না। কেবল এপাশ-ওপাশ করে।

অভিমান ভাঙাইতেও বটে, কিন্তু তারও চেয়ে বেশী—রান্না কেমন হইয়াছে তাহা নিজ মুখে শুনিবার জন্য কাজলীও ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তব পারিল না। বসিয়া বসিয়া অসুস্থা শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। পাশের ঘরে বিষ্ণুরথ যখন রাগে, অভিমানে, হতাশায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, এঘরে তখন শাশুড়ী-বৌতে কথা চলিতেছিল ঃ

—বেয়ানের চিঠিখানা ক'দিন হ'ল এসেছে বৌমা, তার জবাব আর দেওয়া হয়নি। আজ আর পারিনে বাপু, কাল দোব। মনে পাড়িয়ে দিও তো, বুঝলে ?

—আচ্ছা।

—আবার দিদি বললে চটেন, বেয়ান বলা চাই।

দু'জনেই হাসিল।

—বাড়ীর চিঠিও তো অনেকদিন আসে নি, না বৌমা ? কেমন আছেন সব কে জানে ?

—তাইতো।

তোমার চিঠি তো পাঁচ-ছ'দিন হ'ল গেছে ? পাঁচ-ছ'দিন হবে না ?

—তা হবে বই কি ! গেল সোমবারে দিয়েছি আজ শনি। কাল বোধ হয় উত্তর আসবে।

গৃহিণী অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, বোধ হয়।

তারপর বলিলেন, তোমার চিঠি পাওয়ামাত্র জবাব দেন। অথচ চিঠি দেওয়ার অভ্যেস ওঁর ছিল না। বিষ্টুর চিঠি প'ড়েই থাকত। কত ব'লে ব'লে তবে সাত দিন পরে হয়তো জবাব দিতেন, নয়তো দিতেন না। তবু তো এখনও তোমার হাতের সেবাও পাননি, তোমার হাতের রান্নাও খাননি। তাহ'লে দেখছি বাড়ীর বার করাও মুস্কিল হবে।

বলিলেন, আজ বেশ রেঁধেছিলে বৌমা। চমৎকার রান্না হয়েছিল।

লজ্জায় কাজলী মুখ নত করিল।

ওঘরে তখন বিষ্ণুরথ একবার এপাশ ফিরিয়া, একবার ওপাশ ফিরিয়া, একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে উঠিয়া বসিয়াছে। বেলা দু'টার বেশী নয়, কিন্তু পড়ন্ত রৌদ্রের দিকে চাহিলে মনে হয় বেলা আর বেশী নাই। সম্মুখের পাহাড়ের গায়ে ছায়া আরও ঘন হইয়াছে। কিন্তু শালবনের মাথায় মাথায় রোদ্র বেশ চিক্‌চিক্ করিতেছে।

এদিকের জানালা দিয়া রেললাইন এবং স্টেশনের অনেকটা দেখা যায়। শুইয়া শুইয়া স্টেশনটা দেখিতে আশ্চর্য্য লাগে। যেন পটে আঁকা ছবি, মাটির সঙ্গে যোগ নাই! ওখানে কেহ টাঙাইয়া রাখিয়াছে, যে কোনো মুহূর্ত্তে সরাইয়া লইয়া যাইবে। কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই। ট্রেণের পর ট্রেণ আসে; ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। সমস্ত স্টেশন যাত্রীর কলরবে চঞ্চল হইয়া ওঠে। মনে হয় শুধু যাত্রী নয়, স্টেশনটা শুদ্ধ এই ট্রেণে কোন্ অজ্ঞাত দূরদেশে চলিয়া যাইবে, পিছনে পড়িয়া থাকিবে শূণ্য মাঠ। কিন্তু ট্রেণ চলিয়া যায়। বিষণ্ণ স্টেশন শূন্য মাঠে খাঁ খাঁ করে। যেন সঙ্গীরা তাহাকে একা ফেলিয়া পলাইয়া গেল, সঙ্গে লইয়া গেল না। কোন অজ্ঞাত সুদূরের তৃষ্ণায় বিষ্ণুরথের মনও সেই সঙ্গে হু হু করিয়া ওঠে।

বিষ্ণুরথের মনে হইল, মিথ্যা, মিথ্যা, সমস্ত মিথ্যা। মিথ্যা

অপরিচিতকে পরিচিত করার প্রয়াস, মিথ্যা স্নেহ মায়া মমতা, মিথ্যা মানুষের জন্য মানুষের দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ। আসে বটে,—জীবনের তরুচ্ছায়ায় দুটি একটি আসিয়া জোটে। কিন্তু যাবার বেলায় কেহ কাহাকেও ডাকিয়া যাওয়ার সময় পায় না।

বিষ্ণুরথ চাকরটাকে এক গ্লাস জল দিবার জন্য ডাকিল।

এক মিনিটের মধ্যে কাজলী এক গ্লাস জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। যেন কতকাল পরে কাজলীকে দেখিল—এমনি ভাবে অবাক হইয়া বিষ্ণুরথ তাহাকে দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে জলের গ্লাস তুলিয়া লইল।

লজ্জিতভাবে হাসিয়া কাজলী বলিল, আমার কিন্তু দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। চায়ের জল হয়ে গেছে। দু'খানা লুচি ভেজেই নিয়ে আসছি।

পিছু ডাকিয়া বিষ্ণু বলিল, লুচি থাক কাজলী, শুধু এক বাটি চা হ'লেই হবে।

পিছু ফিরিয়া হাসিয়া কাজলী বলিল, রাগ করেছ?

—না, রাগ নয়। ক্ষিধে নেই।

—রোজ থাকে, আজ নেই?

কাজলী কাছে সরিয়া আসিল। ম্লান মুখে বলিল, আমার ওপর রাগ করো না। তোমার কাছে আসতে আমার কি সত্যিই ইচ্ছে হয় না? কিন্তু কত যে বাধা সে তো জান।

—তোমার ওপর রেগেছি এ কথা তো বলিনি।

—না বলনি। তুমি যা চাপা, কোনোদিন কিছু বলবে না। কিন্তু আমি কি কিছু বুঝি না?

—বোঝ?—বিষ্ণুরথের মন ধীরে ধীরে নরম হইতেছিল। তখনই

নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, চা দেবে না? জল যে ফুটে শেষ হ'তে চলল।

কাজলী বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সে দীর্ঘশ্বাস বিষ্ণুরথের বুকে পৌছিল নিশ্চয়। তবু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল না। নির্ব্বিকার ভাবে রেল লাইনের দিকে চাহিয়া রহিল।

১২

অল্পদিনের মধ্যেই দত্ত পরিবারের সঙ্গে বিষ্ণুরথের যথেষ্ট পরিচয় হইয়া গেল।

দত্তসাহেব নিজে প্রকাণ্ড পণ্ডিত লোক। এবং এত বড় পণ্ডিত লোকের যাহা হয়, কোনটা তাঁহার নিজের মত আর কোনটা নয় বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। যে বিষয়েই আলোচনা উঠুক, বিরুদ্ধ পক্ষে তাঁহার যথেষ্ট বলিবার কথা থাকে। সাধারণত দাঁড়ায় বিষ্ণুরথ ও মিস্ দত্ত (মিস্ অনুভা দত্ত) একদিকে। তাহাদের বয়স কম, সুতরাং মতামত সব বিষয়েই উগ্র এবং স্পষ্ট। অন্যপক্ষে দত্তসাহেব একা, আর আছে তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য। তাঁহার কথা বুঝিতে ইহাদের যথেষ্ট ক্লেশ হয়, কারণ কিছুই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন না।

তর্ক করার মতো বেড়ানোও দত্তসাহেবের আর একটা রোগ। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভ্রমণ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি কোনো কিছুর খাতিরেই একটা বেলাও ভ্রমণ বন্ধ হইবে না, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। কিছু দূরেই একটা পাহাড় আছে। তাহার পাদদেশে এক শিলাখণ্ডের

উপর বৈকালিক আসর বসে। আসর জমাইবার পক্ষে স্থানটি মনোরম সন্দেহ নাই। পাশে শালবন দূর দিগন্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। পিছনে পাহাড়ের পটভূমিকা! ওপাশে যতদূর দেখা যায় লাল মাটি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আভায় টক্ টক্ করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা নেড়া মহুয়া গাছ নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। নেড়া, কিন্তু তাহার ডালে ডালে এত টিয়াপাখী আসিয়া বিশ্রাম করিতেছে যে সে এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।

দত্তসাহেব প্রতিদিনের অভ্যাসমত লাঠিটি পাশে ঠেস দিয়া রাখিয়া নিজের শিলাসনে বসিলেন। অনুভা এবং বিষ্ণুরথ প্রতিদিনের মতো সম্মুখের দুইটি পৃথক শিলাখণ্ডে আসন গ্রহণ করিল।

বিষ্ণুরথের দিকে চাহিয়া অনুভা হাসিয়া বলিল, আপনি আসাতে তবু একটা উপদ্রবের হাত থেকে বেঁচেছি বিষ্ণুবাবু। আগে আগে বাবা এখানেও বই নিয়ে আসতেন!

অধ্যয়ন দত্তসাহেবের আর এক ব্যাধি। এক হাতে সিগারেট আর এক হাতে একখানা বই থাকাই চাই। লোক আসিলে বইএর পঠিত স্থানে আঙ্গুল রাখিয়া বন্ধ করিয়া কথা বলেন। লোক চলিয়া গেলেই আবার পড়িতে বসেন।

দত্তসাহেব মেয়ের কথায় হাসিয়া বলিলেন, কত আর তোমাকে বকাই বল? সমস্ত দিন বকাচ্ছি, আবার এখানে এসেও যদি বকাই....

দত্তসাহেব কথাটা শেষ না করিয়া বিষ্ণুরথের দিকে চাহিয়া সমর্থন-সূচক হাসিলেন।

বিষ্ণুরথ বলিল, আপনি তো কেবলই ইংরেজি পড়েন দত্তসাহেব। বাংলা বই আপনার হাতে একদিনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না।

অনুভা অকারণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, বাবা যে সাহেবমানুষ বিষ্ণুবাবু!

দত্তসাহেব অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া বলিলেন, না না, সাহেব নয়। পড়েছি বই কি, রবিবাবুর দু'একখানা বই পড়েছি।

দুই একখানা?—উহারা দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

অনুভা বলিল, অত হবে?

দত্তসাহেব নিরীহভাবে বলিলেন, তা হবে বই কি! নীল মলাটের সেই বইখানা তো সেদিন পড়লাম। তার আগে আর একখানাও পড়িছি।

বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, কেন পড়েন না? ভালো লাগে না?

ঘাড় নাড়িয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, তাই।

বলিলেন, দেখ, তোমাদের গল্প-উপন্যাসের কিছুই আমি বুঝি না। ওরাও তো লেখে। তাতে তাদের নিজের দেশের কথা থাকে, তোমরা যে কোন্ দেশের কথা লেখ ঠিক করতে পারি না।

বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দেশের কথা লেখে ব'লে মনে হয়?

দত্তসাহেব উত্তর দিল, তাও বলা শক্ত। মনে হয়, কোনো একটা বিশেষ দেশেরই নয়। মনে হয়, খানিকটা রাশিয়ার কথা, খানিকটা জার্মানির, খানিকটা ফ্রান্সের, খানিকটা ইংল্যাণ্ডের আর খানিকটা মার্কিন মুলুকের।

দত্তসাহেব হাসিয়া উঠিলেন।

অনুভা মাথা নাড়িয়া বলিল, বাবার যত আজগুবি কথা!

—আজগুবি কথা? আচ্ছা, কয়েকখানা ভালো বইয়ের নাম দাও।

কালই বইয়ের দোকানে চিঠি লিখে দোব। দেখি যদি মত পরিবর্ত্তন হয়। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, কিছু প্রবন্ধের বইয়েরও নাম দিও।

বিষ্ণুরথ বিব্রতভাবে একবার অনুভার দিকে চাহিয়া দত্তসাহেবকে বলিলেন, প্রবন্ধের বই বেশী নেই।

দত্তসাহেব সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, নেই তো? আমি জানি কি না! যা এক আধখানা বাংলা বই পড়েছি তাতেই বুঝতে পেরেছি, সমস্যার ধার দিয়েও তোমরা যাবে না। ঘনঘটা ক'রে বড় বড় সমস্যা হয়তো আনলে, কিন্তু যে সমস্যার একটা লোক তার জীবনকালেও মীমাংসা করতে পারে না, তিন পৃষ্ঠার মধ্যে তার মীমাংসা ক'রে তোমরা তাকে কবরে পাঠালে। অসুবিধা নেই,—নির্গুণ পরম ব্রহ্ম আছেন, সগুণ বিধাতা পুরুষ আছেন, তার ওপর দেশজননীর দুরদৃষ্ট তো আছেই।

অনুভা আগাইয়া আসিয়া বলিল, অসুবিধা নেই-ই তো। আমরা ওদের মতো অকারণে জীবনে জটিলতা আনি না,—ব্যক্তির জীবনেও না, সমাজের জীবনেও না। এই আমাদের সনাতন প্রথা, এই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম।

দত্তসাহেব বিস্মিতভাবে শুধু বলিলেন, সনাতন ধর্ম? সনাতন প্রথা?

অনুভা উত্তেজিতভাবে বলিল, বটেই তো। আমাদের জীবনযাত্রা সরল, সমস্যাও কঠিন নয়। বিশেষ আমরা ভগবানের বিধানে বিশ্বাস করি। রাত্রির অন্ধকারে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ নেই। তাতে পথ হারাবার ভয়ই বেশী। তার চেয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকা ভালো। রাত্রির শেষ হবেই তখন ভোরের আলোয় পথ চিনে নেওয়ার অসুবিধা হবে না।

দত্তসাহেব পরিহাস করিয়া বলিলেন, হুঁ? তোমাকে কে বললে এই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম, কিম্বা এই আমাদের সনাতন প্রথা?

—বলবে আবার কে? যারাই কিছু লেখাপড়া ক'রেছে তারাই জানে।

—যেমন তুমি আর বিষ্ণুরথ?

দত্তসাহেব হাসিলেন। কহিলেন, তারা কিছুই জানে না। সত্যে মিথ্যায় কাহিনীতে মেশানো ভারতের অ[illegible] ইতিহাসের যতটুকু পাওয়া যায়, তাতেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, জীবনকে কোথাও তারা সঙ্কীর্ণ করেনি। ঈর্ষা করেছে, লোভ করেছে, হানাহানি করেছে, নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করেছে। তাদের প্রেমের কাহিনীও তেমনি উদ্দাম। সমস্যাকেও তারা কোনোদিন চোখ বুজে এ[illegible]য়ে চলতে চায়নি। তারা শাদা চোখে সমস্যাকে দেখেছে এবং নিজে[illegible]ই তাকে যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করেছে, ভগবানের জন্যে ফেলে রাখেনি। জীবনকে ভোগ করেছে কত! অনেক ক্ষেত্রে আতিশয্যও ঘটেছে। কিন্তু তাতে কি! বলিষ্ঠ মানুষের জীবনে অমন হয়। হয় না তোমাদের। তোমাদের ছোট-ছোট ঈর্ষা, মিঠে-মিঠে লোভ, হানাহানিও পরিমিত।

বিষ্ণুরথ শান্তভাবে কহিল, একে কি আপনি বর্ব্বরতা বলেন না?

—কিছু বর্ব্বরতা তো ছিলই। সমাজ তখন সবে তৈরী হচ্চে যে! তোমরা সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিলে বলেই আমি অতীত কালকে টেনে আনলাম, নইলে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

অনুভার তখনও উত্তেজনা কাটে নি। বিরক্তভাবে বলিল, তাহ'লে আপনি কি করতে বলেন?

—কিছুই না, শুধু একটুখানি চোখ মেলে চলতে অনুরোধ করি। দেশে আজ সমস্যার অন্ত নেই। সমাজের জীবনে এসেছে বহু জটিলতা,

মানুষের জীবনে এসেছে অভাব। অনুরোধ ক[illegible] বন্ধ ক'রে সব চিন্তার ভার বিধাতাপুরুষের ঘাড়ে চাপিও না। [illegible]ক একা, তাতে অনেক কাল থেকে ভেবে আসছেন,—বয়সও হয়েছে। না হয় তোমরা নিজেরাই একটু ভাবলে!

তাঁহার কথার ভঙ্গিতে অনুভা এবং বিষ্ণুরথ দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

অনুভা বিষ্ণুরথের দিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া বলিল, তাহ'লে এখন থেকে এই সব ভাবুন বিষ্ণুবাবু।

দত্তসাহেবের কথাটা বোধ হয় বিষ্ণুরথের মনে লাগিয়াছে। সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। পাহাড়ের আড়ালে এখানটা স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। শালবনের চূড়ায় চূড়ায় এবং টিয়াপাখীর পাখায় পাখায় অল্প রোদ তখনও চিক্‌মিক করিতেছে।

অনুভার মাথায় সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু [illegible]লিল, হু।

—হু, কিন্তু এখন নয়। পাশেই জঙ্গল আছে, আর আছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। সন্ধ্যার পরে স্থানটা গভীর চিন্তার পক্ষে অনুকূল হবে না।

এদিকটায় কিছু লোক চলাচল আছে। বেশীর ভা[illegible] এ দেশের জঙ্গলী লোক। তাহারা ভারে ভারে কাঠ লই[illegible] গ্রামের দিকে ফিরিতেছে। ঋজু দীর্ঘদেহ, যেন কালো মার্বেলে কোঁদা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, এক টুকরা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা। পরণে কৌপীন। কাহারও হাতে রূপার বালা আছে, কাহারও নাই।

দত্তসাহেব লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বলিলেন, সমস্যা নেই এ কথা আমরা বলতে পারি? পারে এরা। কেমন বেপরোয়া চলার ভঙ্গি চেয়ে দেখ।

অনুভা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হাত জোড় করিয়া করুণভাবে বলিল, কালকে দেখব বাবা। আজকে উঠুন, সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

লাঠিটা বাঁ হাত হইতে ডান হাতে লইয়া দত্তসাহেব হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, এই যে উঠি।

বিষ্ণুরথ গুরুপন্থী লোক। সর্ব্ব ব্যাপারে উপদেশ দিবার জন্য হাতের কাছে তাহার একজন গুরু চাই। এত দিন ছিল নিত্যরূপ। লাইব্রেরী গড়িতে, পুকুর সংস্কার করিতে, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাকে উত্তেজিত করিতে এবং এই প্রকার অন্যান্য জনহিতকর ব্যাপারে তাহার পরামর্শ লইয়া বিষ্ণুরথ চলিত। সম্প্রতি আসিয়া জুটিলেন দত্তসাহেব।

বিষ্ণুরথ কর্ম্মী লোক। ভাবপ্রবণ। ভাবুক নয়। মনে তার মহৎ প্রবৃত্তি আছে। মহৎ কিছু, বড় কিছু করিবার ইচ্ছা আছে, সময় আছে, শক্তিও নাই তা নয়। কিন্তু পিছন হইতে একজনকে চালাইতে হইবে, পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। নিজের তরফ হইতে সে এই মাত্র বলিতে পারে যে, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সর্ব্ব প্রকার শ্রম-স্বীকারে সে প্রস্তুত। গৃহের আরাম, রমণীর বাহুডোর কিছুই তাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

সে জন্য ছিল নিত্যরূপ। সে চলিয়া যাওয়ার পরে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় কিছুদিন বিলাসসাগরে এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়াইল। এখন আবার মনে হইল, তাহার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, আদর্শ আছে ; এ পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাব দিনগতপাপক্ষয়ের জন্য নয়।

রাত্রে শুইয়া শুইয়াও বিষ্ণুরথ এই কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় পানের ডিবা হাতে কাজলী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। আলোটা এক

কোণে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। দরজা বন্ধ করিয়া আলোটা সে উজ্জ্বল করিয়া দিল। তারপর পানের ডিবাটা বিষ্ণুরথের শিয়রের কাছে রাখিয়া আপন মনেই মিটি মিটি হাসিতে লাগিল। ধ্যান ভাঙিয়া অবাক হইয়া বিষ্ণুরথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাজলীর গাল দুটিতে হয়তো রমণীসুলভ একটুখানি রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু রাত্রে নির্জ্জন কক্ষে স্বামীকে সে মোটেই লজ্জা করে না।

স্বামীর আরও সন্নিকটে ঘেঁষিয়া আসিয়া তাহার মুখখানি আলোর দিকে তুলিয়া বলিল, এখনও রাগ পড়েনি?

—রাগিনি তো।

বিষ্ণুরথ শুইয়া ছিল, দু'খানি হাত অলসভাবে কাজলীর কোলের উপর রাখিল।

—রাগনি? দেখি?

কাজলী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, তবে, গম্ভীর কেন?

তথাপি বিষ্ণুরথের গাম্ভীর্য্য টুটিল না। একটু নড়িয়া চড়িয়া শুধু বলিল, ভাবছি।

—ভাবছ? এত ভাবনা কিসের শুনতে পাই না?

কাজলীর শাড়ীর একটা প্রান্ত লইয়া অন্যমনস্কভা খেলা করিতে করিতে বিষ্ণুরথ বলিল, সে অন্য কথা। দত্তসাহেব আজ একটা কথা বলছিলেন·····

দত্তসাহেবের কথা কাজলী ইতিপূর্ব্বেও অনেক শুনিয়াছে। এ সব বড় বড় কথায় তাহার আগ্রহ কম। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, দত্তসাহেবের কথা থাক। শোন, কাল সকালে উঠেই স্টেশনে গিয়ে বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম ক'রে আসবে।

—হঠাৎ ?

—হঠাৎ নয়। তুমি তো দত্তসাহেব আর তাঁর সুন্দরী মেয়েকে নিয়েঁ দিন রাত্রি মেতে আছ। এদিকে দশ দিন বাবার কোনো চিঠি আসেনি খেয়াল আছে ?

বাবার কথায় বিষ্ণুরথ ধড় মড় করিয়া উঠিল। বলিল, না, না, দশ দিন ? অত হবে না। এই তো সেদিন····

ম্লান-হাসিয়া কাজলা বলিল, সেদিন নয়, দশ দিন হ'য়ে গেল। তোমার দিন রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে খেয়াল তো রাখ না ! বেশ আছ !

অপ্রস্তুত ভাবে বিষ্ণুরথ বলিল, তাহ'লে কালকে····নিশ্চয়ই··· দশ দিন হ'য়ে গেল····আমি তো····আশ্চর্য্য !

তাহার মাথার চুলগুলি ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কাজলী গম্ভীর হইয়া বলিল, আশ্চর্য্য আর কি ! পুরুষ মানুষের স্বভাবই এই।

—না, না···আমি তো ভাবতেই পারি নি ··দশদিন !····তোমাদের একবার····আশ্চর্য্য !····কালই টেলিগ্রাম ক'রে দোব····এর আর····

মাথার শিয়রের দিকের জানালাটা খোলা ছিল। এতক্ষণ কাজলীর তাহা চোখেই পড়ে নাই। হু হু করিয়া খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতে সচেতন হইল। সেটা বন্ধ করিতে গিয়া কাজলী জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

অন্ধকার রাত্রি। বোধ হয় কুয়াসা করিয়াছে। স্টেশনের প্লাটফর্মে সব কয়টি আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঘনীভূত অন্ধকারে সে আলো অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। যাত্রীদের কোলাহলও শীতের চোটে মন্দীভূত। কাজলী অনেকক্ষণ জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় রেলপথ এবং আরও খানিকটা অংশ আলোকিত করিয়া একখানা ট্রেন আসিয়া থামিল। ট্রেনখানি প্রায় ফাঁকা। মাঝে মাঝে দুই একটি কামরায় কয়েক জন করিয়া যাত্রী। তাহারাও নিদ্রিত। ট্রেনখানিও যেন নিদ্রিত পুরী। ঝিমাইতে ঝিমাইতে ভাসিতে ভাসিতে এই ঘাটে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ঠেকিয়া আবার ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া গেল।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাজলী জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

বিছানার কাছে ফিরিয়া আসিয়া একটুখানি কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, দত্তসাহেবের মেয়ে খুব শিক্ষিতা, না?

বিষ্ণুরথ তখনও কি যেন ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, হুঁ।

বিছানার একাংশে নিজের পূর্ব্বের জায়গায় বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাজলী বলিল, আমিও তো এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিতাম!

এতক্ষণে বিষ্ণুরথ তাহার দিকে ভালো করিয়া চাহিল। বলিল, দিতে? দিলে না কেন? আমি তো পড়াতে চেয়েছিলাম। তুমিই তো বললে, পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছ?

বিষ্ণুরথের পাশে টুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া কাজলী সলজ্জভাবে বলিল, এখন থেকে পড়ব। পড়াবে?

তাহাকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, কেন পড়াব না, নিশ্চয় পড়াব। তুমি পড়লে তো আমি বাঁচি।

আনন্দে যেন কাজলী গলিয়া পড়িতেছিল। বলিল, দত্তসাহেব কি বলছিলেন, বলবে? খুব কঠিন কথা নয় তো? আমি বুঝতে পারব?

কাজলীর মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বিষ্ণুরথ সোৎসাহে বলিল, কেন পারবে না? কঠিন আবার কি? জান কাজলী, পৃথিবীর সব চেয়েঁ কঠিন কথা বুঝতেও সহজ, বুদ্ধির বেশী আর দরকার হয় না। শুধু বোঝবার আগ্রহ থাকা চাই। থাকবেই না বা কেন? এ পৃথিবীতে আমরা চাকরী-বাকরী আর ঘরকন্না করতেই তো আসি নি। তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ আছে। সে কাজে অবহেলা করলে···তোমার ঘুম পাচ্ছে কাজলী?

কাজলী একেবারে স্বামীর বুকের মধ্যে ঘেঁষিয়া আসিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, একটু।

—ঘুমোও তাহ'লে।

বিষ্ণুরথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সযত্নে তাহার মাথার বালিশটা ঠিক করিয়া দিল।

সকালে উঠিয়া টেলিগ্রামটা পাঠাইয়া বিষ্ণুরথ যখন দত্তসাহেবের বাড়ী গেল, দত্তসাহেব তখন একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। একটু আগেই বোধ হয় চা খাওয়া শেষ করিয়াছেন। পাশের টিপয়ে চায়ের পেয়ালা তখনও পড়িয়া আছে আর আছে একটা সিগারেটের ছাই ফেলিবার পাত্র। খান কয়েক খবরের কাগজের পাতা পায়ের নীচে পড়িয়া আছে। অনুভা একটা অনভিজ্ঞ মালীকে লইয়া বাগান তদারক করিতেছিল। ইতিমধ্যেই তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো। পরণে একখানা ফিকা ছাইরঙের শাড়ী। পায়ে পাৎলা চটি।

—এস।

দত্তসাহেব কাগজগুলা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া চশমাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

বিষ্ণুরথ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া অনুভার দিকে চাহিতেই অনুভা একটুখানি হাসিয়া দূর হইতেই ছোট্ট একটি নমস্কার করিল।

বলিল, বড় ব্যস্ত।

দত্তসাহেব চিন্তিত মুখে বলিলেন, হিট্‌লারের কাণ্ডটা পড়ছ? বড় বড় লোকের সরাসরি বিচার আর মৃত্যুদণ্ড, আইনষ্টাইনের মতো লোকও নির্ব্বাসিত, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ, কী আরম্ভ হয়েছে জার্ম্মানীতে!

বিষ্ণুরথ বলিল, শুধু জার্ম্মানীতে? রাশিয়ার কথা মনে করুন, ইটালির কথা মনে করুন। পরাধীন দেশের রাজশক্তিও এত অত্যাচার করার আগে দ্বিধা করে।

দত্তসাহেব চুরুটের ছাই সন্তর্পণে ঝাড়িয়া বলিলেন, দেখ, রাজনীতিতে methodটা বড় নয়, motiveটা বড়। রাজনীতির ভালোমন্দ সাধারণ নীতির মাপকাঠিতে বিচার করতে যাওয়া ভুল। ওরা ডিক্টেটার। সময় সংক্ষেপ। যা করতে চায়, তাড়াতাড়ি করতে হবে। বিলম্বের অবকাশ নেই। সামনে যে পড়বে, বাধা যে দেবে, তার মুখ তখনই বন্ধ করতে হবে। উদ্দেশ্য যদি কোনো দিন সিদ্ধ হয়, আদর্শ রূপ পায়, এ সব ছোট খাটো ভুলের জন্যে তখন সময় ম[illegible] দুঃখ প্রকাশ করলেই চলবে।

বিষ্ণুরথ সবিস্ময়ে বলিল, ছোট খাটো ভুল? বিনা বিচারে মানুষের প্রাণদণ্ড, বিনা বিচারে নির্ব্বাসন, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, এ সব আপনি ছোট খাটো ভুল বলেন?

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দত্তসাহেব উপেক্ষার সঙ্গে বলিলেন, ছোট খাটো বই কি? জাতির জীবনে এই ক'টি লোকের মৃত্যুর মূল্য কি!

মহাকালের খাতায় এই কয়েকটা বৎসরের অনাচারের হিসাব কতটুকু জায়গা নেবে! সে কিছু নয়। কিন্তু জান তো এই অনাচার সমস্ত জাতির সমর্থন পেলে কি ক'রে?

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, জাতির সমর্থনের কে অপেক্ষা রাখে? ডিক্টেটার?

—নিশ্চয়। যে ক'রেই হোক, জাতির সমর্থন পেতে হবে। নইলে ডিক্টেটারের পরমায়ু কতক্ষণ? নানা অশান্তিতে, নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে জাতি যখন হাঁফিয়ে ওঠে, বিড়ম্বনা যায় মাত্রা ছাড়িয়ে তখনই আসে ডিক্টেটার। সে বলে, আমি পারি বাঁচাতে। কিন্তু আমার হাতে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে দিতে হবে। তুমি হিটলারের বক্তৃতা পড়েছ?

বিষ্ণুরথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার মনে পড়িতেছিল তাহার নিজের গ্রামের ছোট ডিক্টেটার তার পিতাকে। কিন্তু তফাৎ আছে। সে তফাৎ ডিক্টেটারশিপ সনাতন হইলে যা হয় তাই, নইলে মূলে একই।

দত্তসাহেব হাসিয়া বলিলেন, সেই এক কথা! অতীত জার্ম্মানীর পুরোনো গৌরবের স্মৃতি, সেই পিতৃভূমি সকল দেশের সেরা, সকল জাতির গুরু। সেই জার্ম্মানীর কল্যাণে জগতের কল্যাণ, জার্ম্মানীর ঐশ্বর্য্যে জগতের সমৃদ্ধি। যে কথা ফিক্‌টে বলেছে, বিস্‌মার্ক বলেছে দেশকে মাতাবার জন্যে সেই একই কথা বলে হিট্‌লার। প্রত্যেক দেশের বড় বড় নেতার বক্তৃতা যদি পড়, দেখবে, কম-বেশী সবাই নিজের নিজের দেশ সম্বন্ধে এই বিশ্বাস করে।

দত্তসাহেব হাসিয়া বলিলেন, এই সব দেশভক্তের দল পৃথিবীতে যত রক্ত স্রোত বইয়েছে, এত আর কেউ নয়। এত নিষ্ঠুরও আর কেউ

হ'তে পারে না। কেন না এদের নিষ্ঠুরতার পিছনে থাকে নীতির সমর্থন।

বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, একি ভালো?

—কে জানে, ভালো কি মন্দ! একজনের ভালো, আর একজনের মন্দ। এক দেশের ভালো, আর এক দেশের মন্দ। এমন কোন বিধান আবিষ্কৃত হয়নি যা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ভালো। আমার এমনও মনে হয়, যা রাশিয়ার পক্ষে অমৃত, তা হয়তো ইংলণ্ডের পক্ষে বিষ।

বিষ্ণুরথ গম্ভীরভাবে কথাটা ভাবিতে লাগিল।

দত্তসাহেব হাত নাড়িয়া বলিলেন, চুলোয় যাক জার্ম্মানী। আমাদের কালকের আলোচনাটা শেষ হ'তে পায় নি। কথা হচ্ছিল সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে, না?

সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে বিষ্ণুরথের উৎসাহ বাড়িল। ওদিকে বাগান হইতে অনুভা তাহাকে হাতের ইঙ্গিতে বলিল, পালিয়ে আসুন। বিষ্ণু হাসিল, কিন্তু উঠিল না।

দত্তসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সাহিত্যিকদের কাউকে চেনেন?

—কাউকে না। চেনবার দরকার কি?

বিষ্ণুরথ জোর করিয়া নড়িয়া বসিল। বলিল, আমি চিনি, কয়েক জনকে। দত্তসাহেব, আপনি সাহিত্যিকদের দেশসম্বন্ধে দায়িত্বের কথা বলছিলেন, আমি প্রশ্ন করি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে দেশের কোনো দায়িত্ব নেই?

দত্তসাহেব চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, নিশ্চয় আছে। আগে ছিল রাজার, এখন দেশের।

বিষ্ণুরথ উকিলের মতো প্যাঁচাইয়া জেরা করিতে লাগিল:

—বেশ। সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা পরে আলোচনা করব। আপাতত দেশ তার দায়িত্ব কতখানি পালন করছে তাই দেখা যাক। বাংলা দেশে ইংরেজি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ খুব কম হ'লেও দিন ষাট হাজার বিক্রি হয়। তার ওপর সাপ্তাহিক আছে, মাসিক পত্র আছে। আট আনা দামের মাসিক পত্রই তো মাসে কম পক্ষে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার কাটে। অথচ এক টাকা দামের একখানা বইএর সংস্করণ হ'তে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর লাগে। এর কারণ অর্থাভাব নয় নিশ্চয়ই।

বাংলার সাহিত্যজগতের সঙ্গে দত্তসাহেবের পরিচয় অতি অল্প, নাই বলিলেই চলে। বিষ্ণুরথের কথা সেই অন্য তিনি যথেষ্ট আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছিলেন।

বলিলেন, যদি বলি এরা দেশের মনের মতো ক'রে লিখতে পারছে না?

—দেশের মনের মতো ক'রে? হায়রে বিধাতা, তাহ'লে এদের "বড় ঘরের বড় কেচ্ছা" লিখতে হয়। কারণ তিন মাসের মধ্যে বইখানার তেরোটা সংস্করণ হয়েছে। কোনো দেশের সত্যিকার সাহিত্যিক দেশের মনের মতো ক'রে লিখেছেন? না, দেশ কখনও তার কাছে এই কথা জানাবার সাহস পেয়েছে?

দত্তসাহেব বলিলেন, দেশেরও তো মন বলে একটা পদার্থ আছে!

—আছে। সাহিত্যিকের মন তারও চেয়ে একশো বছরের রাস্তা এগিয়ে চলে। খদ্দেরের খাতিরে তাকে পিছিয়ে আনতে গেলে সাহিত্যকে পিছিয়ে আনা হবে। আর আমাদের দেশের মন? আমাদের দেশে সাবালক হওয়ার পরে ভদ্রলোকে আর বই পড়ে না, জন বুশেলের অফিসে চাকরী করতে যায়। পড়েন কুললক্ষ্মীরা। তাই প্রবন্ধ সাহিত্যের অত অনাদর। আর একটা হাসির কথা জানেন দত্তসাহেব, এদেশে ছোট

গল্পের বই, একবারে চলে না। যা কিছু চলে উপন্যাস, অর্থাৎ উপন্যাস নামে প্রচলিত বই, আসলে যে গুলো বড় গল্প।

দত্তসাহেব বিস্মিত ভাবে বলিলেন, ছোট গল্প চলে না? কেন?

বিষ্ণুরথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, কারণ সে গুলো শীঘ্রি শেষ হ'য়ে যায়। তাতে মানুষের জন্ম থেকে বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার খুঁটিনাটি লেখা থাকে না। সে অচল। বাংলা দেশে মানুষের মর্য্যাদাই শুধু বেতনের বহরে নির্ণয় করা হয় না, রসবস্তুর মর্য্যাদাও কলেবরের ওপর নির্ভর করে। এদেশে আট আনার টিকিট ক'রে লোকে সন্ধো আটটায় থিয়েটারে ঢুকবে, ভোরে বেরিয়ে একেবারে গঙ্গা স্নান ক'রে বাড়ী ফিরবে, তবে না থিয়েটার? মাসিকপত্রের শ্রেণীবিভাগও মূল্য হিসাবে হয়। সাপ-ব্যাঙ যাই থাক, আট আনা দাম হ'লেই তা প্রথম শ্রেণীর। চার আনার সত্যিকার ভালো মাসিকপত্রও এদেশে অচল।

দত্তসাহেবের বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের দিকে চাহিয়া বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, জানেন এ সব খবর? এই বাংলা দেশ, যেখানকার লোক মাথার অহঙ্কার ক'রে বেড়ায়।

দত্ত সাহেব বলিলেন, তাহ'লে এদেশের সাহিত্যিকের তো বড় দুঃখ?

—অত্যন্ত দুঃখ। একমাত্র সান্ত্বনা মৃত্যুর পর প্রচুর ফুলের মালা পাবে।

—তাহ'লে শুধু সাহিত্য ক'রে এদের তো চলা সম্ভব নয়?

—তাই চলে? মলয় হাওয়া এবং চাঁদের আলো খেয়ে পেট তো আর ভরে না।

দত্তসাহেবের মুখের উপর গাঢ় বেদনার ছায়া পড়িল। একটুক্ষণ নত মুখে কি ভাবিয়া বলিলেন, দেখ, রাশিয়ায় যারা নবযুগ এনেছে, সেই

সাহিত্যিকের দলকেও কম দুঃখ পেতে হয়নি। তবু তো তারা দেবার মতো জিনিস অনেক কিছু দিয়েছে!

—সত্যি। কিন্তু রাশিয়ার সাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিকের তুলনা করবেন না।

—কেন?

—কেন? এই দুটো দেশের সমাজের গড়নই আলাদা। পরিবার প্রতিপালনের এত বড় দায়িত্ব আর কোনো দেশের লোকেরই নেই। নিজের খাওয়ার-পরার কষ্টটা বড় কষ্ট নয় দত্তসাহেব। সে কষ্ট সবাই সইতে পারে, এরাও পারে। পারে না পরিজনের দুঃখ-কষ্ট সইতে। সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই কাল আপনি আনলেন দত্ত-সাহেব। কিন্তু রাত্রে যাদের পরের দিনের সকালের ভাবনা ভাবতে হয়, সকালে ভাবতে হয় রাত্রের ভাবনা, মহৎ কিছু ভাবার কই তাদের সময়? কোথায় অবকাশ বৃহৎ কিছু গড়ার?

মাথা নীচু করিয়া দত্তসাহেব নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। কোনো সাড়া দিলেন না।

বিষ্ণুরথ উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিল, সেকালে ছিল রাজা। কবির সংসার প্রতিপালনের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে দিয়েছিলেন অফুরন্ত ছুটি। আপনার মনের আকাশে সে গেয়েছে পাখীর মতো গান, মৃণ্ময়ের চোখে এনেছে চিন্ময়ের স্বপ্ন। আজ এসেছে গণতন্ত্রের যুগ। বে-হিসেবী কবির ভার সে নিতে পারে? কবির পাখা গেছে কাটা, মনের আকাশ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। দুঃখ করতে চান করুন, কিন্তু এর প্রতিকার নেই।

দত্তসাহেব অস্ফুট স্বরে বলিলেন, অন্য দেশে তো····

বাধা দিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, না। তার কারণ তারা আমাদের মতো

এত নীচে নামেনি,—অর্থেও না, রসবোধেও না। রাজার দায়িত্ব তারা যতটা সম্ভব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এটা তারা বুঝেছে জাতিকে বাঁচাতে হবে। এদেরও যদি আর সকলের মতো মার্চেন্ট অফিসে গিয়ে দশটা-পাঁচটা হিসাবের খাতা খুলে বসতে হয়, তাহ'লে লজ্জার আর শেষ থাকবে না। তারা বুঝেছে এ কথা।

দত্তসাহেব একটু ভাবিয়া বলিলেন, দারিদ্র্যবরণ কি একালে একেবারেই অসম্ভব?

দারিদ্র্য সম্বন্ধে এদেশের একটা মজ্জাগত মোহ আছে, কাষায় বস্ত্র এবং দারিদ্র্য। *দারিদ্র্যবরণ বলিতেই এক সঙ্গে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে গ্রামপ্রান্তে* কলস্বরা নদীতীরে ছোট্ট কুটির, *সুমার্জ্জিত পবিত্র* অঙ্গন, শ্যাম স্নিগ্ধ বটচ্ছায়াতলে ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি,—সহস্র পুরুষের মধ্যে যিনি পুরুষোত্তম, যাঁর ভাস্বর ললাটে জ্ঞানের আভিজাত্য, নয়নে লোকাতীত প্রতিভার গৌরব।

বিষ্ণুরথ থমকিয়া গেল। কি যে উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় অনুভা আসিয়া তাহার একখানা হাতে টান দিয়া বলিল, উঠুন।

—কোথায়?

ঘাড় বাঁকাইয়া অনুভা বলিল, মাটি খোঁড়ার লোকের ভাবে আমি কাজ করতে পারছি না, আর উনি দিব্যি এখানে ব'সে তর্ক করছেন। উঠুন বলছি।

দত্তসাহেব ভদ্রসন্তানের দুর্গতিতে বিব্রত হইয়া বলিলেন, আহা, তোমার মালীটা কোথায় গেল?

ঝঙ্কার দিয়া অনুভা বলিল, মালীটা জল তুলবে না? আসুন।

অনুভা বিষ্ণুরথকে একরূপ টানিয়াই উঠাইয়া লইয়া গেল। যাওয়ার সময়

চুপি চুপি বলিল, বাজে তর্ক করতে এত ভালোও লাগে আপনার? মহৎ চিন্তায় কি হয় বলুন তো? ডিস্পেপ্‌শিয়া ছাড়া আর কিছু সত্যি সত্যি হয়?

•

দুপুরবেলা আহারাদির পর বিষ্ণুরথ একবার গড়াইয়া লইল। কিন্তু ঘুম আসিল না। সকালে বাড়ীতে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। এতক্ষণ উত্তর আসা উচিত ছিল। কেন আসিল না কে জানে? মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া কেবল বাহির হইতেছে, কাজলী আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

—দত্তসাহেবের ওখানে যাচ্ছ তো? এই দুপুরবেলা?

—না।

বিষ্ণুরথ পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

—ওখানে যেতে পাবে না।

কাজলীর আয়ত চোখে আশ্চর্য্য মিনতি! ঠোঁট কাঁপিতেছে। কিন্তু বিষ্ণুরথের মন অভাবিতরূপে এতই অন্যমনস্ক ছিল যে কিছুই তাহার চোখে পড়িল না।

শান্তস্বরে কহিল, স্টেশনে যাচ্ছি কাজলী। বাবার টেলিগ্রাম কেন যে এল না জানি না। এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

চকিতে কাজলী পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যেন কতকটা অপ্রস্তুত এবং অনুতপ্তভাবে বলিল, তাই তো। কি যে হ'ল!

বিষ্ণুরথ চিন্তিতভাবে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাজলী বলিল, যদি জবাব না আসে আর একটা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম ক'রে দিও বরং—প্রিপেড্।

—দেখি তো !

বিষ্ণুরথ বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের ঘরে বসিল। কোনো টেলিগ্রাম আসে নাই। বিষ্ণুরথ বার বার করিয়া স্টেশন মাস্টারকে অনুরোধ করিয়া আসিল যেন টেলিগ্রাম আসামাত্র তাহার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল তথাপি কেহ আসিল না দেখিয়া আবার একবার স্টেশনে গেল। এবং আধঘণ্টা সেখানে অনর্থক অপেক্ষা করিয়া হতাশ-ভাবে ফিরিয়া আসিল।

এমন সময় দত্তসাহেব তাঁহার লাঠিটা ঠুক ঠুক করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, এবং এমন অসময়ে তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

একখানা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়া দত্তসাহেব বলিলেন, তোমার সকালের কথাটাই ভাবছিলাম বিষ্ণুরথ। তোমার দিবানিদ্রা অভ্যাস নেই দেখছি। বেশ, বেশ। সরকারী চাকরীর কল্যাণে আমারও ও বদ অভ্যাস সংগ্রহ করার সুযোগ হয় নি।

দত্তসাহেব হাসিলেন।

বলিলেন, এ জীবনে ভেবেছি অনেক কথা। কিন্তু বিশেষ কোনো কথা, বিশেষ ক'রে নিজেদের ঘরের কথা এমন ক'রে কোনো দিন ভাবি নি। তুমিই প্রথম ভাবালে।

বিষ্ণুরথ তথাপি যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না এমনভাবে চাহিয়া রহিল।

দত্তসাহেব আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, দেশ আগে তৈরী হবে তারপরে তার সাহিত্য তৈরী হবে এমন তো হয় না। জাতির কল্যাণের

জন্যে সাহিত্যিককে দুঃখবরণ করতেই হবে। তোমার কি মনে হয় একালে তা সম্ভব নয়?

বিষ্ণুরথ এতক্ষণে যেন খেই ধরিতে পারিল। বলিল, কি ক'রে সম্ভব হবে? এ যুগে টাকার প্রয়োজন····

তাহার কথাটা লুফিয়া লইয়া দত্তসাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, অপরিহার্য। অপরিহার্য। আমারও তাই মনে হয়, ছেলেপুলের লেখাপড়ার খরচ আছে, মেয়ের বিয়ে আছে····

বিষ্ণুরথ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, স্ত্রীর গয়না আছে।

—আছেই তো। হাতে লাল সুতো বেঁধে স্বামীগর্ব্বে পুলকিত হয়ে বেড়াবে এমন মেয়ে একালে কই?

নেই।

অনুভা বাপের পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, নেই একালে তেমন মেয়ে। সেই দুঃখ গাইতে আপনি এই দুপুর বেলায় এতদূর এসেছেন? ধন্য!

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, মেয়েদের সম্বন্ধে আজকাল সাবধান হয়ে কথা কইবেন দত্তসাহেব! ওঁরা আজকাল নিজেদের অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত মনোযোগী হ'য়েছেন।

পা দোলাইয়া অনুভা বলিল, উপায় কি? নিজেদের অধিকার নিজেরা না রাখলে চলে?

বিষ্ণুরথ তাহার জবাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ বাহিরে টেলিগ্রাফ-পিওন হাঁক দিল, তার হ্যায় বাবু!

বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সই দিয়া টেলিগ্রামটা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং এক নিশ্বাসে পড়িয়া পাথরের মূর্ত্তির মতো নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দত্তসাহেব ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার ?

অনুভা তাহার হাত হইতে টেলিগ্রামটা কাড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া বলিল, আপনার বাবার অসুখ ? কই কোনো দিন বলেননি তো ?

—আমি নিজেও জানতাম না।

বলিয়া কোনো দিকে না চাহিয়া বিষ্ণুরথ ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ভিতরে একটা চাপা সোরগোল উঠিল।

দত্তসাহেব উদ্বিগ্নভাবে মেয়েকে বলিলেন, তুমি একটু ভেতরে যাও মা। ওঁরা বোধ হয় খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। বোধ হয় আজই যেতে হবে, বাঁধা-ছাঁদা আছে। তুমি বরং....

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অনুভা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে, বিষ্ণুরথের জননী আপাদ মস্তক ঢাকিয়া মেঝেয় নিশ্চলভাবে শুইয়া আছেন। তাঁহার পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে কাজলী। আর বিষ্ণুরথ তাঁহাদেরই অদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে দত্তসাহেব ঠিক বলিয়াছিলেন। বস্তুত অনুভা না থাকিলে ইহাদের জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদাও হইত না, বিকালে ট্রেনে রওনা হওয়াও হইত না।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিয়াও বিষ্ণুরথ যখন দেশে পৌঁছিল, তখন ত্রৈলোক্যবাবুর অন্তিম মুহূর্ত। শেষ মুহূর্তে ত্রৈলোক্যবাবুর শুধু একবার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূর সঙ্গে চোখের দেখাটাই হইল। একটা কথাও তিনি বলিয়া যাইতে পারিলেন না। কিছুকাল হইতে এদিকে এক প্রকারের ম্যালেরিয়া হইতেছে, তাহাতে বাহাত্তর ঘণ্টা রোগ ভোগের পর রোগী সেই যে চোখ বন্ধ করিতেছে আর মেলিতেছে না। এই কয়দিনের মধ্যে এই নিদারুণ রোগে ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এদিকে ভাল ডাক্তার নাই। পাশের গ্রামে যে ভদ্রলোক আছেন রোগের এবং রোগীর আধিক্য দেখিয়া তিনি ফি দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন। সে টাকা দিয়া গরীব গৃহস্থের তাঁহাকে একবারের উপর দুইবার ডাকিবার সঙ্গতি নাই। শেষ অবস্থায় ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া কেহ বা মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একবার ডাকিতেছে, কেহ তাও পারিতেছে না। ইহার উপর গুরু পরিশ্রমের অবসাদ কাটাইবার জন্যই হোক, অথবা ভয়ের জন্যই হোক, ডাক্তারবাবু মদ্যপানের মাত্রা এত বাড়াইয়া দিয়াছেন যে, পাঁচজনে ধরাধরি করিয়া প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁহাকে রোগীর কাছে বসাইয়া দেয়। তারপর চোখ বুজিয়া তিনি কি দেখেন এবং অনর্গল অশ্রাব্য চীৎকার করিতে করিতে কি ঔষধ দেন তিনিই জানেন। তাহাতেই কোনো কোনো রোগী ভাল হইয়া যায়, কোনো কোনো রোগী হয় না। ভালো হইলে ডাক্তারের হাত যশ, না হইলে রোগীর অদৃষ্ট।

বিষ্ণুরথের জননী তিন দিন মুহুর্মুহু ফিটের পর সম্প্রতি উঠিয়া বসিয়াছেন বটে, কিন্তু কেমন যেন জবুথবু হইয়া গিয়াছেন। কেহ

কোনো কথা বলিলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকেন। কিছু বলিতেও পারেন না, বুঝিতেও পারেন না। কাজলী সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেইখানেই তাঁহার কাছে বসিয়া থাকে।

কিন্তু বিষ্ণুরথকে শোক ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিতে হইল। সময় অল্প। ইহার মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তির সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। আত্মীয়, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীরা আসিতেছেন। সে ছেলে-মানুষ, অনভিজ্ঞ। ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কিছু করার শক্তি নাই। এত বড় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপযুক্ত সমারোহে শ্রাদ্ধ করিবার একটা ফর্দ্দ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় এমন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল যাহাতে বন্ধুরা না চটিলেও আত্মীয় এবং শুভানুধ্যায়ীরা মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

এ জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী নিত্যরূপ। ত্রৈলোক্যবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কয়েকটি দিনের জন্য জননীকে লইয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ওলট-পালট করিয়া দিয়া এই কাণ্ড বাধাইল। স্থির হইয়াছিল, প্রজাদের কাছ হইতে শ্রাদ্ধ বাবদ দুই হাজার টাকা চাঁদা তোলা হইবে, আর জমিদারী তহবিল হইতে দেওয়া হইবে পাঁচ হাজার টাকা। এই টাকাটা ব্যয় করিলে [illegible]ড়াগাঁয়ে যে সমারোহ হইবে তাহা বিষ্ণুরথের স্বর্গীয় পিতামহের শ্রাদ্ধের পর এ অঞ্চলে আর হয় নাই। নিত্যরূপ সর্ব্বপ্রথম প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা তোলার ব্যবস্থাটা রদ করিয়া দিল। বাকী সরকারী তহবিল হইতে পাঁচ হাজার টাকাই খরচ হইবে বটে, কিন্তু শ্রাদ্ধের জন্য খরচ হইবে মাত্র এক হাজার টাকা। বাকী চার হাজার টাকা দিয়া ত্রৈলোক্যবাবুর নামে গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইবে। প্রজারা ইচ্ছা করিলে জমিদারের প্রতি সম্মান নিবেদনের জন্য যাহার যাহা খুশী দাতব্য চিকিৎসালয় ভাণ্ডারে

দিতে পারে। কিন্তু সেজন্য কাহারও উপর কোনো জোর করা হইবে না।

গ্রামের আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী তরফ হইতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গৃহিণীর নিকট যথেষ্ট প্রতিবাদ জানানো হইল। কিন্তু সকলেই হতাশ হইয়া এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেলেন যে, গিন্নার ভীমরথি হইয়াছে, আর বেশীদিন বাঁচবেন না।

এই ভাবে নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইয়া গেলে নিত্যরূপ জননীকে লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিষ্ণুরথকে বহু উপদেশ দিয়া গেল। বিষ্ণুরথ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ভাববিলাসী ছেলে। তাহার জন্য নিত্যরূপের চিন্তার অবধি নাই। ওখান হইতেই বার বার সে এই কথা লিখিয়াছে যে, নিজেকে ঠকাইও না তাহা হইলেই আর কেহ তোমাকে ঠকাইতে পারিবে না।

দত্তসাহেবও আগে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুরথ তাহার উত্তরে এখানে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া একখানা পত্র দিয়াছিল। দত্তসাহেবের কলিকাতায় বোধ হয় একখানি বাড়ী আছে। কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকেন বলিয়া মনে হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য একমাত্র সম্বল মেয়েটিকে লইয়া প্রায়ই দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। সুতরাং কিছু দিন এখানে ঘুরিয়া গেলে মন্দ হইবে না। কিন্তু সেও আসল কথা নয়। আসল কথা দত্তসাহেবের যদি এ জায়গাটা ভালো লাগিয়া যায় তাহা হইলে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য বিষ্ণুরথ জায়গাও ছাড়িয়া দিতে পারে। নিত্যরূপকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাহিরে থাকিতেই

হইবে। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় না এ সময় যদি দত্ত-সাহেবকে এখানে কোনো ক্রমে টানিতে পারা বিষ্ণুরথ অনেক কিছু করিতে পারে।

সে পত্রেরও উত্তর কয় দিন হইল আসিয়াছে। পড়িয়া মনে হয় দত্তসাহেবের দিন কয়েক এখানে কাটাইয়া যাইতে তত অনিচ্ছা ছিল না। আপত্তি অনুভারই বেশী। পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তাহার একটা ভয় আছে,—সাপ, ম্যালেরিয়া এবং আরও অনেক কিছুর ভয়! চিঠির শেষ দিকে সেও লাইন দুই লিখিয়া বিষ্ণুরথের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং মাঝে মাঝে পত্র লিখিবার অনুরোধ জানাইয়াছে।

সুতরাং বিষ্ণুরথ একা! পরামর্শ দিবার জন্য নিত্যরূপও রহিল না, দত্তসাহেবও আসিলেন না। একা তাহার গোলমাল লাগে, কাজে জোর পায় না। তবু উপায় কি?

জমিদারী হিসাব-নিকাশ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিবার প্রয়োজনও হয় নাই, দেখেও নাই। সম্প্রতি দেখিতে হইতেছে এবং ধীরে ধীরে মনও বসিতেছে। ওদিকে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ইট পোড়ানো আরম্ভ হইয়াছে। প্রজাদের কাহারও কাছ হইতে এই জন্য এক পয়সাও চাঁদা ওঠে নাই। কর্ম্মচারীরা বলিতেছে, জোর করিয়া না আদায় করিলে এক পয়সাও উঠিবে না। যত দিন যাইতেছে ততই বিষ্ণুরথ কর্ম্মচারীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেছে। তবু স্থির করিয়াছে জোর করিবে না। শুভবুদ্ধি যদি তাহাদের কোনো দিন জাগে ভালোই, নহিলে সে নিজেই যাহা পারে করিবে। জনহিতের নামে জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন করিবে না।

অকস্মাৎ নানা কাজের মধ্যে পড়িয়া বিষ্ণুরথের নিশ্বাস ফেলিবার

অবকাশ নাই। সকালে আসিয়া কাছারীতে বসে। জমিদারী হিসাব-পত্র আছে। নানা কাজে নানা লোকও আসে। ভিতরে গিয়া চা পান করিয়া আসিবারও সময় পায় না। বাহিরে চা আসে। পড়াশুনার অভ্যাসটা রাখিয়াছে। দুপুরে আহারাদির পর লাইব্রেরী ঘরেই সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়া খবরের কাগজটা উল্টাইয়া দেখে। দুই একখানা বইও পড়ে। তারপর চা খাইয়া আবার বাহির হইয়া যায়, ফিরিতে রাত্রি এগারটার কম হয় না। বিকালে মাঠের দিকে একটু বেড়াইতে যায়, কিন্তু আর কয় দিন পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে সে সময়ও বুঝি মিলিবে না। একটা লাইব্রেরী এবং একটা নৈশ বিদ্যালয় বহু পূর্ব্বেই খোলা হইয়াছিল। কিছুদিন না দেখার ফলে দু'টাই যাইতে বসিয়াছিল। বিকালে নিজে একবার করিয়া লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া আসে। ছেলেদের ব্যায়ামের জন্য একটা আখড়া খোলা হইয়াছে সেখানেও যাইতে হয়। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম হয় নৈশ বিদ্যালয়ে। অন্তত দুই ঘণ্টা করিয়া নিজে না পড়াইলেই নয়।

সময় কাজলীরও নাই। শাশুড়ীর ওই অবস্থা। অত বড় সংসারের সমস্ত ভার এই বয়সেই তাহাকে লইতে হইয়াছে, এবং বোধ হয় সে-বলিয়াই পারিয়াছে। দুই দণ্ড নিরিবিলি বসিয়া স্বামীর সঙ্গে গল্প করিবার সময় আর পায় না। রাত্রে আত্মীয়-পরিজন, দাসী-চাকরের খাওয়া-দাওয়া এ বাড়ীর সনাতন প্রথামত নিজে তদারক করিয়া যখন সে শয়ন কক্ষে আসে তখন রাত্রি একটা। বিষ্ণুরথ তখন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আর তাহার নিজেরও চোখ তখন ঘুমে ঢুলিয়া আসে।

কিন্তু সেদিন তাহার স্বামীকে কতকগুলি জরুরী কথা বলিবার ছিল। বিষ্ণুরথ আহারাদি সারিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া পানের ডিবা খুলিতেই দেখিল

একখানা চিঠি। লেখা আছে, একটু কষ্ট করিয়া জাগিয়া থাকিও। অনেক কাজের কথা আছে।

বিষ্ণুরথ আপন মনে হাসিল। এত দিন পরে কাজের কথা! তাহার মনে হইল, কত যুগ যেন সে কাজলীকে দেখে নাই, তাহার মুখের একটা কথাও শোনে নাই। গোটা দুই পান মুখে পুরিয়া চিঠিখানা মুঠায় করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। কিন্তু কত দেরী করে কাজলী? সাড়ে বারোটা বাজিয়া গেল যে! তাহার কি রোজই এমনি দেরী হয় না কি?

একটাও বাজিতে যায়। বিষ্ণুরথ একখানা বই টানিয়া লইয়া কোণের সোফায় গিয়া বসিল। পড়িতে মন লাগেনা, কাজলীর জন্য অনেক দিন পরে তাহার মন আবার অনেক দিন আগের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ দ্বার বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না।

কাজলী এই কয়দিনেই এমন হইয়াছে!

লতার মতো তনুদেহে ঈষৎ স্থূলতা আসিয়াছে। মুখখানি বেশ ভারিক্কি দেখাইতেছে। কৌতুক-চঞ্চল সে দুটি চোখ গেল কোথায়? এই কয়দিনে কাজলী রীতিমত গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে।

সে দৃষ্টিতে কাজলী ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে, যেন বিষ্ণুরথকে দেখিয়াও দেখিল না। ভাঁড়ারের, রান্না ঘরের এবং আরও কোথাকার এক গোছা চাবি ঝন করিয়া ওদিকের টিপয়ের উপর রাখিয়া, আঁচল দিয়া অনাবশ্যক একবার মুখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, এখনও ঘুমোও নি যে বড়!

বিষ্ণুরথ তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, তোমারই জন্যে জেগে আছি।

এতদিন পরে স্বামীর আদরে কাজলীর কেমন লজ্জা করিতেছিল। মুখ নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কি ভাগ্যি!

কাজলী বলিল, তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া আছে।

—ঝগড়া? না, কাজের কথা?

মাথা দোলাইয়া কাজলী বলিল, কাজের কথাই বটে, কিন্তু ঝগড়া।

হঠাৎ বিষ্ণুরথের যেন কি মনে পড়িয়া গেল। টেব্‌লের আলোর দম কমাইয়া এদিকের বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই এক ঝলক চাঁদের আলো তাহাদের পায়ের কাছে মেঝেয় আসিয়া পড়িল।

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, আজ পূর্ণিমা। ঝগড়াও করতে নেই, কাজের কথাও বলতে নেই, জান?

মাঘের শেষ। এদিকে তখনও বেশ শীত আছে।

কাজলী তাড়াতাড়ি বলিল, তা হোক, জানালা খুলছ কেন? শীত করছে যে?

বিষ্ণুরথ তাহাকে নিজের গায়ের কাপড়ের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল, করুক শীত। শীতই তো ভালো। শীতের জন্যে পূর্ণিমা বৃথা যাবে?

কাজলীর সমস্ত দেহে কামনার খরস্রোত বহিতেছিল। কিন্তু মুখে বলিল, হুঁ, বয়স দিন দিন বাড়ছে, না কমছে?

বিষ্ণুরথ তাহাকে একটা নাড়া দিয়া বলিল, বাড়ছে ব'লে কি তিন দিনে তিরিশ বচ্ছর বাড়বে, যেমন তোমার বেড়েছে?

কাজলী মাথা নাড়িয়া বলিল, আহা, আমার কত ঝঞ্ঝাট জান!

এই সংসারের সমস্ত ভার আমার ওপর। খুকী সেজে ব'সে থাকলে আর চলে না?

ও কেমন গিন্নী-বান্নীর মতো ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কথা বলে। তাহার কথা বলিবার এই নূতন ভঙ্গি দেখিয়া বিষ্ণুরথের কেমন আমোদ বোধ হইতেছিল। সে তাহার ঠোঁটের দিকে চাহিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

কাজলী অকারণে ললাট একবার মুছিয়া বলিল, ভারী বিশ্রী দেখতে হয়েছি, না? যা খাটুনী!

বিষ্ণুরথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না, আরও সুন্দরী হয়েছ। সত্যি, সত্যি। নূতনতর সুন্দরী। খুনসুড়ি করার জন্যে হাতটা নিসপিস করছে। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আর সাহস হচ্ছে না। সত্যি!

কোপ-কটাক্ষ হানিয়া কাজলী বলিল, আহা!

একটু থামিয়া বলিল, শোন, তুমি নাকি প্রজাদের খাজনার সুদ সব মাপ ক'রে দিচ্ছ?

—তোমার কাছে আবার কে বলতে এল?

—যেই বলুক, তুমি বল না সত্যি কি না?

একটু ভাবিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, সত্যি। গেল সন একেবারে অজন্মা গেছে। তার আগের বছরও ভালো ফসল হয়নি। খাজনা দিতে পারে না, সুদ দেবে কি ক'রে?

কাজলী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি দেবে কি ক'রে? ডিস্পেনসারী হচ্ছে, তার খরচ আছে। প্রজারা তো এক পয়সাও দেবে না!

—তা দেবে না।

—শুনলাম গেল কিস্তির সমস্ত টাকা ঘর থেকে দিতে হয়েছে

আবার চৈত্র কিস্তি আসছে। এ টাকা বোধ হয় ঋণ ক'রে দিতে হবে।

বিষ্ণুরথ বিস্মিতভাবে কহিল, এত খবর তুমি শুনলে কি ক'রে? এ নিশ্চয় হালদার দাদার কাজ।

বিষ্ণুরথ মিথ্যা অনুমান করে নাই। হালদার মহাশয় ইহাদের এষ্টেটের নায়েব বলুন, ম্যানেজার বলুন, সব। ত্রৈলোক্যবাবু তাঁহাকে কাকা বলিতেন এবং পিতার আমলের কর্ম্মচারী বলিয়া খাতির করিতেন। বয়সও যথেষ্ট হইয়াছে। এ বাড়ীতে তাঁহার অবাধ গতিবিধি। কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর মতো রাশভারী এবং জেদী লোকের উপর তিনি যতটা আধিপত্য চালাইতেন, বিষ্ণুরথের উপর তাহার সিকি আধিপত্য চালাইতেও তাঁহার ভরসা হয় না। এই অপরিণতবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ যুবক যে কখন কোন পথে চলিবে তাহা তিনি ঠিকই করিতে পারেন না। কাজলীকে তিনি ছেলেবেলা হইতে জানেন। এবং সম্প্রতি তাহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এই মেয়েটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী। তাই এষ্টেটের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাহারই কাছে জানাইয়া গিয়াছেন।

কাজলী বিষ্ণুরথকে একটা ধমক দিয়া বলিল, যে দাদাই বলুক, তুমি বল না চৈত্র কিস্তি কি ভাবে দেওয়া ঠিক করেছ?

সে সম্বন্ধে এখনও সে কিছুই ঠিক করে নাই, এত আগে কিছু ভাবিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। বিশেষ কাজলী যে কোনো দিন তাহাকে ধমক দিতে পারে তাহা কল্পনাতীত। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কাজলী আবার বলিল, গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয় রেভিনিউ মাফ করবে না।

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, নিশ্চয় না।

--কিস্তি দিতে না পারলে ডিফল্টরইনও মাফ হবে না।

—নিশ্চয় না।

মাথা দোলাইয়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কাজলী বলিল, না কে৹ প্রজাপালনের দায়িত্ব কি একা তোমার? গভর্ণমেণ্টের নেই?

বিষ্ণুরথ এতক্ষণে একটা জবাব দিবার মতো কথা পাইল। হাসি: বলিল, গভর্ণমেণ্ট যদি সে দায়িত্ব পালন না করে তো ? কি করব?

তীব্রস্বরে কাজলী বলিল, তুমি কিছুই করবে না। তুমি অঃ করবে কি? তোমার কতটুকু শক্তি!

বিষ্ণুরথ চুপ করিয়া রহিল।

কাজলী বলিল, শুনলাম বাবা যে সব ডিক্রি ক'রে রেখে গেছেন তা৹ তুমি জারী করবে না ব'লে প্রজাদের আশ্বাস দিয়েছ। সেও ে হয় সত্যি?

বিষ্ণুরথ হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, সত্যি। প৹ করেছি, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে আমি ওদের বাঁচাব,—দুঃখের হাত থেকে, অসম্মানের হাত থেকে, অপমৃত্যুর হাত থেকে।

কাজলী কৌতুক করিয়া বলিল, তারপরে?

—তারপরে যা হবার হোক।

বিষ্ণুরথ উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীকে কাজলী চেনে। পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে তাহার জোড়া নাই। কাজলী হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল। পরম স্নেহে তাহার বিশৃঙ্খল চুলগুলি সমান করিয়া দিল। বলিল, পান খাবে?

—দাও।

ডিবা হইতে পান আনিয়া কাজলী আগের মতো তাহার বুকের একান্ত

সন্নিকটে দাঁড়াইয়া একটি একটি করিয়া দুইটি পান মুখে পুরিয়া দিল। তারপর ডিবাটি যথাস্থানে রাখিয়া আবার পাশে আসিয়া বসিল।

বলিল, কাল দাদার চিঠি এসেছে দেখেছ?

—নিত্যদার চিঠি? না তো!

কাজলী দুঃখ করিয়া বলিল, কখন দেখাই? তুমি ক্রমেই দুর্লভ উঠছ।

—আমি দুর্লভ হ'য়ে উঠছি? মিথ্যে বোলো না কাজলী।

কাজলী তাড়াতাড়ী বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই না হয় দোষী! স্বীকার করছি। হ'ল তো? মার্জ্জনা পাব তো?

কাজলী হাত জোড় করিল। বিষ্ণুরথ কোনো কথা না বলিয়া শুধু তাহার যুক্তকর দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। এই অবসরে কাজলী নারীর চিরন্তন প্রথার আশ্রয় লইয়া আপনার দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া লইল। বিষ্ণুরথ কেবল কঠোর হইতেছিল, আবার কোমল হইয়া গেল।

কাজলী বলিল, তোমার সব কথা জানিয়ে দাদাকে পত্র লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, তোমার মাথাটি খেয়েছেন বেশ ক'রেছেন। আবার আমার মাথা কেন খাওয়া?

কাজলী হাসিল।

বিষ্ণুরথও হাসিল। তাহার নরম দুইটি হাতে চাপ দিয়া বলিল, তারপরে? নিত্যদা কি জবাব দিলেন?

—তুমি নিজের চোখেই দেখ না। ছাড়ো, চিঠিখানা আনি।

কাজলী উঠিতে যাইতেছিল। বিষ্ণুরথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, চোখের এখন অসবর হবে না। আরও বড় কাজে ব্যস্ত আছে। তুমি বল, আমি শুনি।

—লিখেছেন, মানুষের দায়িত্ব একমুখী নয়, বহুমুখী। সকল দায়িত্ব বহন করা সহজ নয়। তবু চেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন, তোমার দায়িত্ব শুধু প্রজাদের সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের ওপরও একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু সে না হয় আমি স্মরণ করিয়ে নাই দিলাম। শুধু এত বড় বংশের মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তোমার হাতে, সকল কাজের মধ্যেও এটুকু স্মরণ রেখো এই আমার অনুরোধ।

ওদিকে জানালাটা দিয়া হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া খোলা থাকার ফলে বেশ শীত করিতেছিল। সেইটা বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া বিষ্ণুরথ হাসিতে হাসিতে বলিল, আচ্ছা, অনেক বক্তৃতা হ'য়েছে। রাত ছুটো বাজে তার খেয়াল আছে ?

—ছুটো ?

কাজলী চাহিয়া দেখিল ছুইটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী আছে। তা হবে বই কি। কাজলীই তো আসিয়াছে প্রায় একটার সময়।

এমন সময় দরজায় ঠুক ঠুক করিয়া কয়েকটা টোকা পড়িল। কাজলী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। সেখানে কাহার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিয়া মিনিট খানেক পরে ফিরিয়া আসিল।

বিষ্ণুরথ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি ?

—ছুটি চাই। ডাক এসেছে।

এত রাত্রে কে আবার ডাকে! নীচেও যেন কাহাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। দরজা বন্ধ থাকার জন্যই হোক, অথবা অন্যমনস্ক থাকার জন্যই হোক এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই।

বিষ্ণুরথ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি ? ব্যাপার কি ?

কাজলী কাছে আসিয়া বলিল, কাল তোমার জন্মদিন। পাড়ার দু'পাঁচজন লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বেশী কিছু নয় অবশ্য, তবু এখন থেকে না আয়োজন করলে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে।

তাই! বিষ্ণুরথের মনে পড়িল, চিরকাল মা এই দিনে পাঁচ জনকে খাওয়ানো-দাওয়ানোর একটা আয়োজন করিতেন। এবারে তিনি অসমর্থ। সমস্ত ভার কাজলীর উপর। কিন্তু তথাপি কাজলীকে ছাড়িয়া দিতে কিছুতে মন চাহিল না।

বলিল, কেন, ওরা পারবে না ?

হাসিয়া কাজলী বলিল, পারবে না কেন ? আমি ম'রে গেলে কি আর তোমার জন্মতিথি উৎসব বন্ধ থাকবে ? তবু আমি যতদিন আছি, আমি না থাকলে চলে ?

বিষ্ণুরথ তাহাকে বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া ফেলিল। বলিল, চলে।

কাজলী এক মুহূর্ত্ত তাহার বুকের মধ্যে চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, ছিঃ, ছাড়। সবাই নীচে কাজ করবে, আর আমি তোমার কাছে ব'সে থাকব ?

—ক্ষতি কি ?

বিষ্ণুরথের চোখ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। একবার সে চোখের দিকে চাহিয়া কাজলী চোখ নামাইয়া ফেলিল। অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, লজ্জা করবে না ?

—না।

বিষ্ণুরথের সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছিল না।

কাজলী একটুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল। তারপর নিরীহ শান্ত কণ্ঠে বলিল, ছাড়। দরজা খোলা রয়েছে।

হাওয়ায় ভেজান দরজা খুলিয়া গিয়াছিল। বিষ্ণুরথ তাহাকে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ছাড়িয়া দিল।

কাজলী তাহাই চাহিতেছিল। ছাড়া পাওয়া মাত্র চোখের নিমেষে পাখীর মতো অদৃশ্য হইয়া গেল। বিষ্ণুরথ কিছুটা অবাক হইয়া, কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইচ্ছা হইল, নীচে হইতে এই মুহূর্ত্তে তাহাকে পুনরায় ধরিয়া লইয়া আসে। কিন্তু সে সম্ভব নয়।

•

সকালে উঠিয়া বিষ্ণুরথ মাকে প্রণাম করিতে গেল। ও দিকের দালানে একখানি কম্বলের উপর বসিয়া তিনি রৌদ্রসেবন করিতেছিলেন। দেখিলে মনে হয়, কে যেন তাঁহাকে ওইখানে ওইভাবে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। শান্ত মেয়ের মতো তিনি সেইখানে বসিয়া আছেন। বিষ্ণুরথ প্রতিবৎসর জন্মতিথির দিনে মাকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিয়া তবে অন্য কাজ করে। এবারেও তাহার মনে হইল জন্মতিথির কথা মা ভোলেন নাই। কিন্তু অন্যবারের মতো এবারে আর তাঁহার মুখে সেই পবিত্র হাসির রেখাটি দেখা গেল না। বিষ্ণুরথ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল তাহারও আর কোনো উত্তর দিলেন না। বোঝা গেল কথা কহিতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইতেছে। বিষ্ণুরথ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

কাছারী বাড়ীতে বারান্দার এদিকে বসেন হালদার মশাই, অন্য দিকে অন্যান্য কর্ম্মচারীরা। ওদিকের ঘরে বসে বিষ্ণুরথ।

হালদার মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার গত রাত্রের কথা

মনে পড়িয়া গেল। অন্যদিন নিজের ঘরে যাইবার আগে এখানে দাঁড়াইয়া দুই চারিটা কথা কহিয়া যায়। কিন্তু আজ কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। কোনো দিকে না চাহিয়া সোজা হন্ হন্ করিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ঘরের বাহিরে কয়েকজন খাতক ও প্রজা বসিয়াছিল। তাহাদের দিকেও সে দৃকপাত করিল না।

একটু পরে হালদার মহাশয় আসিয়া কয়েকটা কাগজ টেবলের উপর ফেলিয়া দিলেন। সে তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া কাগজগুলায় একবার চোখ বুলাইয়া সহি করিল।

চিন্তিতভাবে হালদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভায়ার কি শরীর ভালো নেই ?

তাড়াতাড়ি বিষ্ণুরথ বলিল, না, ভালোই আছে তো।

হালদার আর কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

একটু পরে চা-জল খাবার আসিল। বিষ্ণুরথ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বাহিরে যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সকলকেই সে চেনে। কেন যে আসিয়াছে তাহাও জানা।

ছোট পালজির পৈত্রিক আমলের কিছু দেনা সুদে আসলে অনেক টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। গত বৎসর সে কিছু দিয়া বাকিটা কিস্তিবন্দী করিয়া লইয়াছিল। মাঘের এই কয়টা দিন গেলেই কিস্তি খেলাপ হইবে। গত আশ্বিন মাসে বড় পালজির সঙ্গে একটা পাঁচীল লইয়া ফৌজদারী করিয়া বেচারী একেবারে জেরবার হইয়া পড়িয়াছে। মামলাটায় এদিকে ওদিকে প্রায় দুইশত টাকা খরচ হইয়া যায়। এখন বিষ্ণুরথ রক্ষা না করিলে তাহাকে ছেলে পুলে লইয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে।

হরিহর দত্ত কয়েক মাস পূর্ব্বে কর্ত্তার কাছে তাহার কন্যার কতক গুলি স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা লইয়া গিয়াছিলেন। সেই

কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রার দিন আসন্ন। দত্ত মহাশয় ভাবিয়াছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রবধু আসিয়া পড়িলে তাহার গহনাগুলি দিয়া কন্যার গহনা ছাড়াইয়া লইয়া যাইবেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় জননীর অসুখের জন্য পুত্রবধূর আসা পিছাইয়া গেল। এখন ভদ্রলোক একখানা হাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার জমিজমা বলিতে এক ছটাক নাই। থাকিলে তাহাই বন্ধক দিয়া হোক, বিক্রয় করিয়া হোক, গহনাগুলি ছাড়াইয়া লইতেন। সে উপায় নাই। এখন বিষ্ণুরথ বলিতে গেলে এক প্রকার তাহার মুখের কথার উপরেই বিশ্বাস করিয়া যদি গহনাগুলি ছাড়াইয়া দেয়, দত্ত মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিতেছেন ফাগুনের শেষাশেষি পুত্রবধূর গহনা জমা দিয়া হাণ্ডনোট ছাড়াইয়া লইয়া যাইবেন। অবশ্য একালে ইহার উপর নির্ভর করিয়া কেহ গহনা ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু ভিন্ন গ্রামে বাস হইলেও বিষ্ণুরথের অসংখ্য দয়ার কাহিনী শুনিয়াই তিনি আসিয়াছেন। এ যাত্রায় তাহাই তাঁহার একমাত্র ভরসা।

নকড়ি ঘোষ নবম বৎসর গৌরীদান করিয়া সেই যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে সে ধাক্কা আর কিছুতে সামলাইতে পারিতেছে না। মহাজনের তাগিদের চোটে অস্থির হইয়া সে গর্ত খুঁড়িয়া গর্ত বুজাইবার নীতি আশ্রয় করিয়াছে। ফলে গর্তের পর গর্ত ক্রমেই গভীরতর হইতেছে। তাহার আরও কিছু টাকা ঋণ প্রয়োজন।

একমাত্র আমতলায় হরিশ তন্তুবায়ের যে দল বসিয়া জটলা পাকাইতেছে টাকার প্রয়োজনে আসে নাই তাহারাই! কানালার জলের সেচ লইয়া তাহাদের সঙ্গে সাহাদের বিবাদ বাধিয়াছে। বিষ্ণুরথ যদি আপোষে মিটমাট করিয়া দেয় ভালোই, নহিলে ফৌজদারী তো আছেই। তন্তুবায়রা লাঠিতে ভয় পায় না।

বিষ্ণুরথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। গ্রামের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ অবশ্য সে ছিল না। কিন্তু এমন প্রত্যক্ষ পরিচয় এই প্রথম। এই কয়দিনে লোকের পর লোক আসিয়া অসংখ্য দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। কাজলী জানে না, তাই বাধা দেয়।

তবে কাজলী একটা কথা সত্য বলিয়াছে। তাহার শক্তি সামান্য। ইহারা নিজেরা যদি নিজেদের না বাঁচায়, সে তাহার সামান্য শক্তি দিয়া কতটুকু দুঃখ মোচন করিতে পারিবে? নামিতে নামিতে এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, আজ আর দুর্গতি মোচন ইহাদের নিজেদের করায়ত্তও নয়। আজ একমাত্র প্রতিকার যে রিতে পারে সে রাজা। কিন্তু রাজা....রাজভাণ্ডারে টাকা নাই।

টাকায় বিষ্ণুরথেরও টান পড়িয়াছে। বহু টাকা সুদে খাটিতেছে। কর্ত্তা থাকিলে সুদও আদায় হইত। তাহার আমলে কি সুদ, কি আসল কিছুই যে অদূর ভবিষ্যতে আদায় হইবে এমন সম্ভাবনা কম। মোটা আয় বলিতে জমিদারী আর তেজারতী। কিন্তু জমিদারীতে প্রজায় খাজনা দিতে পারে না, তেজারতীতে খাতকে টাকা দিতে পারে না। পল্লীগ্রামের জমিদারের টাকা ধানে-চালে, তেজারতীতে, প্রজার কাছে এমনি করিয়া ছড়াইয়া থাকে। নগদ টাকা ঘরে অতি অল্পই থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে, যাহাকে বিত্তশালী বলে তেমন কিছু তাঁহারা কোনো কালেই নন। শাদা সিধে মোটা চালের উপর স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায় এই মাত্র। থাকিবার মধ্যে আছে নিজেদের গ্রামের মধ্যে খানিকটা প্রতাপ ও প্রভুত্ব। নহিলে একটা, বড় জোর দুইটা অজন্মা পর পর হইলে অনেকেরই চক্ষু স্থির হইয়া যায়।

হালদার মহাশয় ইতিমধ্যে একবার অন্দর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিষ্ণুরথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, ভায়া কি নিজে ওদের সঙ্গে দেখা করবে? না, আমিই ব'লে দোব সুবিধে হবে না?

বিষ্ণুরথের চমক ভাঙিল।

—আপনি? আচ্ছা, দাঁড়ান....

বিষ্ণুরথ আবার ভাবিতে লাগিল, এবং হালদার মহাশয় এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর হইবে বিবেচনা করিয়া পাশের একটা চেয়ারে বসিলেন।

—আমি বলি....

বিষ্ণুরথ কি বলিবে ভাবিবার জন্য আবার থামিল।

মিনিট কয়েক ভাবিয়া বলিল, তাঁতীদের কথাটা ছেড়ে দিন। ওটা বিকেলে না হয় করা যাবে। ছোট পালজীর কিস্তিবন্দারও না হয় আর মাস কয়েক মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল,—সেও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এখন কথা হচ্ছে হরিহর দত্ত আর নকড়ি ঘোষকে নিয়ে। হরিহর দত্ত...

বিষ্ণুরথ একবার হালদার মহাশয়ের মুখের দিকে আড়চোখে চাহিল। কিন্তু দীর্ঘকাল জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া তাঁহার মুখ পাথরের মতো জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সে মুখ দেখিয়া মনের কথা বুঝিবার কিছু মাত্র উপায় নাই।

বিষ্ণু বলিতে লাগিল, হরিহর দত্ত বিপদে পড়েছেন সত্যি। তা আমি কি করব? ওঁর হ্যাণ্ডনোটের মূল্য কি বলুন? এখন কথা হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের বিশ্বাস। সে অবশ্য কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। সেকালে তো আর হ্যাণ্ডনোট ছিল না। দুপুর রাত্রে মানুষ মানুষকে

শুধুহাতে টাকা দিত। সে টাকা কি আর মারা যেত? যেত না। আপনি কি বলেন?

হালদার মহাশয় কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া বিষ্ণুরথ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আর নকড়ি ঘোষকে কি বলা যায়?

হালদার মহাশয় বুঝিলেন এই প্রকার সুব্যবস্থার মধ্যে তাঁহার না থাকাই ভালো। শুধু ছোট পালজি এবং হরিহর ঘোষ নয়, তাহাদের মতো আরও অনেক খাতক আছে যাহাদের একটু চাড় দিলেই আষাঢ় কিস্তির লাটের টাকার দুর্ভাবনা আর ভাবিতে হয় না। কিন্তু তিনি কর্ম্মচারী মাত্র। যাহার টাকা সে যদি বিলাইয়া দেয় তিনি কি করিতে পারেন? বিশেষ আজকালকার ছেলেদের কোনো প্রকার বৈষয়িক পরামর্শ দিতে তাঁহার ভয় হয়। ইহাদের বিষয়বুদ্ধি নাই, সৎপরামর্শও গ্রহণ করে না। অধিকন্তু কোন্ কথার পৃষ্ঠে কি কথা বলিয়া বসে তাহার কিছু স্থিরতা নাই।

এই প্রকার সাত-পাঁচ ভাবিয়া তিনি হিসাবী লোকের মতো বলিলেন, তুমি কি বলতে বল?

—আমি?

একবার ঢোক গিলিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া বিষ্ণুরথ অবশেষে চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, দেখুন ও টাকাটাও দিয়ে দিন। বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে।

হালদার মহাশয় দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে নিত্যরূপ বাড়ী আসিতে পারে নাই। মাকে লইয়া হরিদ্বারের দিকে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিষ্ণুরথের জননীও শোকের প্রথম ধাক্কা কথঞ্চিত সামলাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সংসার আর তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। তিনিও নিত্যরূপদের সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁহারই জন্য নিত্যরূপের তীর্থ ভ্রমণে বাহির হওয়া। নিত্যরূপের একটি আত্মীয় বাড়ীতে বেকারই বসিয়াছিল। তাহারই সঙ্গে বিষ্ণুরথের জননী এখান হইতে যাত্রা করেন। সম্প্রতি নিত্যরূপের এক পত্রে জানা গেল, সে উঁহাদের সমস্ত উত্তর ভারত ঘুরিয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কলেজ খুলিয়া যাওয়ায় দক্ষিণ ভারত যাইতে পারিল না। তাহার আত্মীয় সাথীটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, সে যেরূপ চালাক চতুর দেখা গেল তাহাতে তাহার সঙ্গে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইতে মায়েদের যে কিছু মাত্র অসুবিধা হইবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পশ্চিমের কলেজে পূজার ছুটি অল্প দিন। সে জন্য নিত্যরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে যে, পূজার বন্ধে তাহার বাড়ী যাওয়া হইবে না। মায়েরা তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে একেবারে তাঁহাদের লইয়া বড় দিনের বন্ধে আসিবে।

এদিকে গ্রামের অবস্থাও শোচনীয়। আষাঢ় শেষ হইয়া গেল, এক ফোঁটা বৃষ্টির দেখা নাই। জমিতে এমন ফাট ফাটিয়াছে যে, তাহার মধ্যে গরু বাছুর পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারিবে না। কোনো পুকুরে এক ফোঁটা জল নাই। সে-বার দীঘিসংস্কার না হইলে লোকে যে কি করিত ভাবিতে বুক কাঁপিয়া ওঠে। গত বৎসর দক্ষিণ ও পশ্চিম মাঠে

একেবারে লাঙল পর্য্যন্ত চলে নাই। পূর্ব্ব ও উত্তর মাঠে যাহাদের জমি তাহারা কিছু ফসল অবশ্য পাইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে খড় ভালো হয় নাই। কাঠ ফাটা রোদ। মাঠের ঘাস পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। লোকে এতদিন ভবিষ্যতের আশায় চালের খড় কাড়িয়া কোনো রকমে গরু বাছুরের খাদ্যের যোগাড় করিয়াছে এখন মেঘের অবস্থা দেখিয়া ভালো ভালো গরু দুই টাকা পাঁচ টাকায় ঝাড়িয়া দিতেছে। তাহারও ক্রেতা নাই।

পল্লীগ্রামে সকল লোকের কিছু জমি থাকে না। বেশীর ভাগ জমি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের। তাঁহারা চাষীদের কাছে ভাগে দেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা চাষীদের ঘরে মজুর খাটিয়া সংসার প্রতিপালন করে। মেঘের অবস্থা দেখিয়া ইহারা দলে দলে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কেহ বাল্মী ব্রীজে কেহ বা দক্ষিণে মজুর খাটিতে যাইতেছে। দক্ষিণে নাকি এমন অবস্থা হয় নাই, আবাদ চলিতেছে। গ্রীষ্মের সময় জেলা বোর্ড হইতে কিছু রিলীফ ওয়ার্ক্ হইয়াছিল। অনেক লোক তাহাতে খাটিয়া কিছু দিন অন্নসংস্থানের সুযোগ পাইয়াছিল। এখন সে কাজও বন্ধ। সুতরাং দেশের মমতায় শুষ্ক মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকায় লাভ নাই।

আগে সাধারণ গৃহস্থ গোলায় আগামী বৎসরের ধান রাখিয়া বাকী বিক্রয় করিয়া দিত। নগদ পয়সা গ্রামের লোকের কম, তাহার কারবারও অল্প। এদিকে চাল দিয়া নুন-তেল-মসলা, তরিতরকারী মাছ কেনার প্রথা। কেবল কাপড় চোপড় এই রকম দুই একটা জিনিসের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হইত। এখন মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। আগে এক জোড়া কাপড় লইলেই "বাবুর মতো" চলিয়া যাইত। কিন্তু শহরের বিলাসিতা আজ হুড় হুড় করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামেও আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। এখন আর তাহাতে চলে না। জুতা চাই, জামা চাই,

মেয়েদের রং-বেরঙের এবং আধুনিকতম ফ্যাশানের জামা চাই। ছেলে-মেয়েরা এখন আর একখানা দোলাই গায়ে বাঁধিয়া শীত কাটাইতে সম্মত নয়। এই তো একদিকের খরচ। অন্যদিকে ছেলেকে স্কুল-কলেজে পড়ানো আছে, মেয়ের বিবাহ আছে, অপরিহার্য্য মামলা-মোকদ্দমা আছে, আরো কত কি আছে। তদ্ব্যতীত ফসলের পরিমাণও কমিয়াছে। সুতরাং মানুষ আর আগামী বৎসরের জন্য ধান বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখান হইতে মাইল ছয়েক দূরে একটা গঞ্জ আছে। এদিকে রেল লাইন হওয়ার পর হইতে একটি দুইটি করিয়া করিয়া এখন অনেক মাড়োয়ারী আসিয়া সেখানে ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। দুঃখ-কষ্ট করিয়া, অথবা ক্রেতার অভাবে যদি বা লোকে কিছু ধান বাঁধিত, তাহারা আসিয়া নানা প্রকারে তাহা যেন শুষিয়া লইয়া দেশ-বিদেশে চালান দিতেছে। তবে রেল লাইনের জন্য একটা সুবিধা এই দুঃসময়ে এই হইয়াছে যে, এ দেশের মোটা ধান লইয়া গিয়া বস্তা বস্তা রেঙ্গুনী আনিয়া নামাইয়া দিতেছে তাহার দর কম। সুতরাং কদন্ন গ্রহণের ফলে এ অঞ্চলে ব্যাধির প্রকোপ বাড়িলেও লোকে ততটা গ্রাহ্য করিতেছে না।

কষ্ট হইয়াছে বেশী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে খরচ বাড়িয়াছে তাহাদেরই! তাহাদেরই ছেলে পড়ানো, মেয়ের বিয়ে। এদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অন্নকষ্ট কাহাকে বলে জানিত না। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান সকলেরই ছিল। কোনো দিন গ্রাসের অন্ন যে কিনিতে হইতে পারে এ সম্ভাবনার কথা কল্পনাতেও আসে নাই। তার উপর যুগমাহাত্ম্যে চালও বাড়িয়াছে। পুরাতন সাদাসিধা চালে ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রথমে ইহারা গহনা বন্ধক দিতে আরম্ভ করে। তারপর সোনার দর চড়িয়া যাইতে কুচা-কাচা

সোনা বিক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু এখন আর তাহাতেও কুলাইতেছে না। প্রায় সকলেই লুকাইয়া লুকাইয়া শহরে গিয়া সোনার ভারি ভারি গহনাও বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। নহিলে দিন চলে না।

বিষ্ণুরথও ধীরে ধীরে জড়াইয়া পড়িতেছে। চৈত্রের কিস্তি কিছু আদায়ী খাজনা হইতে, কিছু ঘর হইতে দিয়া যথাসময়েই চালানো হইয়াছিল। কিন্তু আষাঢ় কিস্তি আর কিছুতে যথাসময়ে পাঠাইতে পারিল না। ডিফল্‌ট্‌ পড়িল। মাথায়-মাথায় ভাবনা হইয়াছে আশ্বিনে কি করিয়া একসঙ্গে দুই কিস্তির খাজনা এবং পূজা চালাইবে। চৈত্র কিস্তির পরেই কতকগুলি তামাদির মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দিলে অনেকেই ভয়ে ভয়ে ঘটি বাটি বেচিয়া, গহনা বন্ধক দিয়া যে টাকাটা দিত তাহাতে আষাঢ় কিস্তির ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে হইয়া যাইত। কিন্তু প্রজাদের কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করিয়া নালিশ করিতে বিষ্ণুরথ কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। অথচ যাহারা আষাঢ় কিস্তির পূর্ব্বেই অন্তত এক সনের খাজনা দিয়া তামাদি রক্ষা করিবেই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাদেরও দেখা নাই। তাহাদেরও দোষ নাই। প্রতি দিবসের গ্রাসের অন্ন সংগ্রহ করিতেই যাহাদের জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যথেষ্ট সততা থাকিলেও তাহাদের পক্ষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অসম্ভব।

এদিকে আশ্বিন কিস্তির বড় আর দেরী নাই। এই অঞ্চলে মহাজন বলিতে যাহারা ছিল তাহারা সকলেই ফাঁপা হইয়া আসিতেছে। মোটা টাকার দেনা চাহিলেই মিলিবার উপায় নাই। খাজনা আদায়ের উপর যখন ভরসা করা চলে না, তখন ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু সে কথা হালদার মহাশয়কে জানাইতে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধিবে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুপ করিয়া থাকিলেও ভিতরে ভিতরে যে কতকখানি উত্তপ্ত হইয়া

আছেন সে কথা বিষ্ণুরথের জানিতে বাকী নাই। সুতরাং সে অন্য লোকের মারফৎ গোপনে ঋণের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

এ অঞ্চলের যাহারা পুরাতন মহাজন, অর্থাৎ বহুকাল হইতে তেজারতী কারবার করিতেছে এবং এককালীন দুই হাজার টাকা বাহির করিতে পারিত তাহারা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বহু টাকা আদায় হয় নাই। তাহার বদলে জমি ঘাড়ে পড়িয়াছে। এই দুর্বৎসরে, যখন জমিতে ফসল নাই এবং ফসলেরও দাম নাই, তখন বৎসর বৎসর অত জমির খাজনা গণিয়া যাওয়া সহজ নয়। তারপরে নূতন যে আইন হইয়াছে তাহাতে দশ টাকা ধার দিয়া হাজার টাকা আদায় করিবার উপায় নাই। নালিশ করিলে কোর্ট লম্বা কিস্তিবন্দী দিয়া দেয়। এই সব কারণে তাহারা কারবার প্রায় গুটাইয়া আনিয়াছে। ধার চাহিতে গিয়া বিষ্ণুরথের লোক পালটা তাহাদের অসংখ্য দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ফিরিয়া আসিল।

বাকী রহিল ফতা মুদী এবং কুঞ্জ দত্ত।

ফতা মুদীর মায়েরা দুই বোন। দুই বোনের মুড়ি-মুড়কি বেগুনী-ফুলুরীর দোকান ছিল। গ্রামের লোকের মুড়ি-মুড়কি কেনার প্রয়োজন হয় না। সময়ে-অসময়ে আত্মীয়-কুটুম্ব আসিলে বেগুনী-ফুলুরী কেনে। দোকান চলে রাহী লোকের জন্য। লোকাল বোর্ডের রাস্তার উপর দোকান। লোক যাতায়াতের কামাই নাই। তবে এ সব দোকানের চলতি শীতকালেই বেশী। মাঠে যখন ধান কাটা হয়, তখন দুই বোন টোকায় করিয়া বেগুনী, ফুলুরী, মুড়ির নাড়ু, মোয়া প্রভৃতি লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিত। মাঠের মজুরেরা দুই এক আঁটি ধান দিয়া প্রয়োজন মত দ্রব্য ক্রয় করিত। সকালে টোকাপূর্ণ বেসাতি লইয়া দুই

বান বাহির হইত। দুপুরে এক এক বোঝা ধান মাথায় করিয়া ফিরিত। ৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও ইহারা শীর্ণদেহে ধানের যে বোঝা বহন করিত তাহা দখিয়াঁ জোয়ান লোকেরও তাক লাগিত। ধান কাটা শেষ হইয়া গেলে ্যবসা মন্দা পড়িত। তখন ইহারা মাঠে গোবর কুড়াইত, এবং সই গোবরে ঘুঁটে দিয়া বিক্রয় করিত।

দীর্ঘকাল এই প্রকার ব্যবসা করার পর একদিন দুই বোন হঠাৎ ারা গেল। রাত্রে দিদির বাড়ীতে খান কয়েক সরুচাকলী খাইয়া ছোট বান নিজের বাড়ীতে শুইতে গেল। সেই রাত্রেই দুজনে অসুস্থ হইয়া ড়ে। সূর্য্যোদয়ের পরেও ঘণ্টা কয়েক বাঁচিয়া ছিল। তারপর সব শেষ হইয়া গেল। লোকে বলে কলেরা।

মৃত্যুর কারণ যাহাই হউক, দেখা গেল—ইহাদের মৃত্যুতে গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রীতিমত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সোনা-রূপার গহনা ইহাদের কাছে বন্ধক ছিল!

মা ও মাসীর সম্পত্তি হাতে পাইয়া ফতেসিংহ প্রথমেই একটা গড়গড়া ও ঘড়ি কিনিল। এত জিনিস থাকিতে এই দুইটি বস্তুর উপর এতদিন ারিয়া কেন যে গোপন লোভ ছিল তাহা বলা কঠিন। এতদিন বৈঠকখানা ছল না। ফতেসিংহ অচিরে একখানা ভালো বৈঠকখানাও তৈরী করিয়া ফেলিল। কিন্তু দিনকতক সেই বৈঠকখানার বারান্দায় মাদুর াাতিয়া গড়গড়া টানিয়া, এবং পকেট ঘড়ি ঝুলাইয়া গ্রাম বেড়াইয়া ফতের অকস্মাৎ সমস্ত লোভের নিবৃত্তি ঘটিল। মাতৃবিয়োগের বৎসর ানেক পরেই ফতে মন্ত্র লইল। ললাটে বাহুতে এবং দেহের আরও অন্যান্য স্থানে তিলকছাপা কাটিল, গলায় মালা লইল, আর চুটাইয়া তজারতী আরম্ভ করিল। একেবারে ভোল বদলাইয়া গেল। যে ফতে

বহু চেষ্টাতেও নিম্নশ্রেণীর পাঠ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, সমবয়সী সঙ্গীর দল নির্ব্বোধ বলিয়া যাহাকে খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদ কোনো ব্যাপারেই সঙ্গে লইতে চাহিত না, অল্পদিনের মধ্যে তাহারই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া গ্রামের লোক যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল দেখা গেল, ধারাপাত পড়া না থাকিলেও প্রয়োজনের সময় কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত সুদ কষিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। এখনও অনেকে গোপনে তাহাকে ফতা মুদী বলিয়া যে ডাকে, সে নিতান্তই হিংসাবশতঃ।

এই লোকটার কাছে টাকা ধার করিতে পাঠাইতে বিষ্ণুরথের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্যত্রও সুবিধা হইতেছে না। বাধ্য হইয়া তাহারই কাছে লোক পাঠাইতে হইল। ফতেসিংহ পরম সমাদরে তাহাকে বসিবার জন্য নিজের হাতে কম্বল পাতিয়া দিল।

বড় ঘরের ব্যাপার। সেখানে আরও অনেক লোক আছে বলিয়া বিষ্ণুরথের লোক তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া কথাটা পাড়িল। বিষ্ণুরথের যে কোনো কারণে ঋণের প্রয়োজন হইতে পারে, হইলেও যে এত লোক থাকিতে তাহার কাছে, একথা ফতেসিংহ প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারিল না। অবশেষে যখন বিশ্বাস হইল তখন সেইখানে ভালো করিয়া উঁচু হইয়া বসিল।

বলিল, বেশ। যখন সুবিধে হবে গহনা নিয়ে আসবেন।

লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, গহনা আবার কি? হ্যাণ্ডনোট।

হ্যাণ্ডনোট শুনিয়া ফতেসিংহ মুখখানা এমন বেঁকাইল যে, বোঝা গেল তাহার মত নাই।

লোকটি হাসিয়া বলিল, তুমি বল কি, ফতেসিং! এই সামান্য টাকার ব্যাপার। বাবু নেবেন ধার, তাতে গহনা বাঁধা দিতে হবে?

ফতেসিং হাতজোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি মুরুক্ষু-সুরুক্ষু মানুষ। গহনা ছাড়া কারবার করি না, জানেনই তো।

লোকটি হাতে একটা তালি দিয়া মুখখানি সচল করিয়া কহিল, অন্য লোকের কথা আলাদা। এ বাবুর নিজের প্রয়োজন। স্বতন্ত্র ব্যাপার।

যাহাদের অনেক কালের তেজারতী ব্যবসা তাহাদের কাছে এত বলিবার দরকার হয় না। কিন্তু ফতেসিংহ সবে তেজারতী করিতেছে। তাহার চাল আলাদা।

সে মুখে কিছু না বলিয়া হাতজোড় করিল।

লোকটি ছদ্ম গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া এবার তাহার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, দিতেই হবে ফতেসিং, না বললে শুনব না। আর সময়ও নেই, অন্য কারও কাছে পাওয়াও গেল না।

ফতেসিংহ শশব্যস্তে তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া এক পা পিছাইয়া আসিল।

জিভ কাটিয়া বলিল, ছিঃ! ছিঃ! ব্রাহ্মণ হ'য়ে····

ব্রাহ্মণ সে কথা শুনিল না। বলিল, তুমি বল কবে দেবে? সুদই বা কত নেবে?

ফতেসিংহ আবার জিভ্ কাটিয়া বলিল, ছি ছি ছি! ব্রাহ্মণের সঙ্গে কি সুদের গোলমাল করব? আমি কুঞ্জ দত্ত নই। সুদ দু'টাকাই দেবেন। কিন্তু হ্যাণ্ড নোটে····

ফতেসিংহ চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিল। হঠাৎ কি মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নিশ্চিন্তভাবে সুদের কয় আনা পয়সা লইয়া দরকষাকষি আরম্ভ করিল।

বিষ্ণুরথের লোকটি অনেকক্ষণ তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিয়া

অবশেষে বাহিরে আসিয়া কম্বলাসনে বসিল। ফতেসিংহ নানা লোকের সঙ্গে নানা কথা কয়, চোখ তাহার লাটাইএর মতো ঘুরিতেছে, কিন্তু বিষ্ণুরথের লোকটি বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার চোখে চোখ ফেলিতে পারিল না।

অবশেষে বাধ্য হইয়া প্রকাশ্যভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, তাহ'লে ওটার কি হবে?

ফতেসিংহ প্রথমটা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

—কোন্‌টা? ও! দেখুন, বলছেন বটে, কিন্তু ও রকম কারবার আমি কখনো করি না!

একটু ভাবিয়া বলিল, তবে হ্যাঁ, বাবু নিজে এসে যদি বলেন, তাহ'লে বিবেচনা ক'রে দেখতে পারি।

বাবুকে নিজে আসিয়া বলিতে হইবে! লোকটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিষ্ণুরথের কর্ম্মচারী ক্রোধে ও বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু জমিদারের কর্ম্মচারী,—পাটোয়ারী লোক। এ গ্রামটা বিষ্ণুরথের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ত্রৈলোক্যবাবুর ছেলের এ অঞ্চলে এখনও এমন দাপ আছে যে, ফতেসিংহকে কান ধরিয়া তাহাদের গ্রাম পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলেও কেহ একটা কথা কহিতে সাহস করিবে না। কিন্তু ঋণ চাহিতে আসিয়া এমন কাণ্ড করিয়া গেলে কেলেঙ্কারীর আর সীমা থাকিবে না। ব্যাপারটা যদিচ ঋণ, তবু ইহার মধ্যে এমন একটা হীনতা কোথাও আছেই যাহাতে ভিক্ষার সঙ্গে কোনো তফাৎ নাই।

বিষ্ণুরথের লোকটি নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িল। যখন সে সিঁড়ির শেষ ধাপে নামিয়াছে তখন যেন ফতেসিংহের অকস্মাৎ খেয়াল হইল ভদ্রলোক চলিয়া যাইতেছেন। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া ভক্তিভরে তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। আমাদের সমাজের গড়নই এমন পোক্ত

হইয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণকে যত অপমানই করি পায়ের ধূলা লওয়ার ত্রুটি রাখি না।

ফতেসিংহ দাঁত বাহির করিয়া বিনীতভাবে বলিল, বুঝছেনই তো···য়ে কারবার কখনো করি নি···আপনি আর না বোঝেন কি···

বিষ্ণুরথের কর্ম্মচারী আর ফিরিয়াও চাহিল না। শুধু চলিতে চলিতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল, সে সমস্তই বুঝিয়াছে।

যথাসময়ে সকল কথাই বিষ্ণুরথের কর্ণ-গোচর হইল, বোধ হয় একটু অতিরঞ্জিত হইয়া। শুনিয়া নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মন ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিল। জীবনে কখনও কাহারও কাছে তাহাকে হাত পাতিতে হয় নাই। হাত পাতা যে এত বড় অপমানজনক এই প্রথম সে অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিষ্ণুরথের মুখের অবস্থা যে কোনো কারণে এমন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিতে পারে কর্ম্মচারীটি তাহা ভাবিতেও পারে নাই। মনে হইল, সকল কথা ইহাকে না জানানোই উচিত ছিল।

ভয়ে ভয়ে বলিল, ঋণের ভাবনা কি বাবু। সবাই ফতা মুদীর মতো এমন ছোট লোক নয়। কুঞ্জ দত্তের ওখানে গেলেই···

—না। আমাকে না জিগ্যেস ক'রে আর কোথাও যাবেন না।

বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া বিষ্ণুরথ অন্দরে চলিয়া গেল।

স্নানাহারের বেলাও হইয়াছিল। বিষ্ণুরথ স্নানাহার সারিয়া লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া একবার দৈনিক কাগজখানা উল্টাইল। কিন্তু শুষ্ক সংবাদের মধ্যে আজ আর মন বসিতে চাহিল না। সেগুলা এক পাশে ফেলিয়া

দিয়া দুই তিনখানা ইংরাজি বই নাড়াচাড়া করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একখানা বাংলা বই খুলিয়া পড়িতে বসিল।

এমন সময় কাজলী চুপি চুপি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। বিষ্ণুরথ একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াই আবার বইতে মন দিল। তাহার মনটাই ভালো নয়।

কাজলী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, পান খাবে ?

—দাও।

একটুখানি মিষ্টি হাসিয়া কাজলী বলিল, আমার ঘরে এস।

সেই ভালো। বিষ্ণুরথের মনে হইল, আর পারা যায় না। সমাজ, সংসার, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাহার ক্লান্তি আসিয়াছে। তাহার বিস্মৃতির প্রয়োজন। তাহার আত্মসম্মানে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহার জ্বালা রহিয়া রহিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। এ সময় কেহ যদি সান্ত্বনা দিতে পারে, সে কাজলী। অথচ এই কাজলীর কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল না।

বই বন্ধ করিয়া বিষ্ণুরথ সাগ্রহে বলিল, চল।

তাহার শয়ন কক্ষের উত্তরের বাতায়ন খোলা। উর্দ্ধে নীল আকাশে স্তরের পর স্তর লঘু মেঘখণ্ড মন্থর গতিতে কোথায় ভাসিয়া চলিতেছিল। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের স্থানে স্থানে ছোট ছোট ধানগাছ পরম আলস্যভরে মাথা নাড়িতেছিল। তাহার সমস্ত মন যেন জুড়াইয়া গেল। একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া আপন অজ্ঞাতসারেই সে একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িল, আঃ!

পানের ডিবাটা আগাইয়া দিয়া কাজলী অদূরে মেঝের উপর বসিল।

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, আজ দিনের বেলায় এত অনুগ্রহ ? মা নেই ব'লে সাহস বেড়েছে বুঝি ?

কাজলী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

বিষ্ণুরথ বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন কত কি ভাবিতে াগিল। একটু পরে কাজলীর দিকে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসিল।

—হাসছ যে!

—একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—কি কথা?

বিষ্ণুরথ নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।

কাজলী আরও কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, বলবে না?

বিষ্ণুরথ নীরবে গম্ভীরভাবে বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ত গম্ভীরভাবে যে কাজলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার বাহিরে এদিক- দিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওদিকের কোণে বকুলগাছের ছায়ায় ইটি লোক বসিয়া আছে বটে, কিন্তু সে তো মালী, আর একজন বোধ য় জনমজুর হইবে।

কাজলী ফিরিয়া আসিয়া চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে?

বিষ্ণুরথ তাহার একখানি হাতে আদর করিয়া ঝাঁকুনি দিয়া লিল, কে আবার! সেই একবার যারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল রাই।

কাজলী বিরক্তভাবে বলিল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি ঝিয়ে বল বাপু। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

বিষ্ণুরথ তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির কে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওরাই। আর বছর, এমনি নে,—মনে পড়ে না তোমার?—আকাশে এমনি শাদা মেঘ সে যাচ্ছিল, দূরে খালের জল চিক্ চিক্ করছিল, আর কচি কঁচি নে লেগেছিল দোলা। তার মধ্যে তুমি এলে। মনে নেই? ওরাই া সেদিন ষড়যন্ত্র ক'রে আমার বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

কাজলীরও চোখের সম্মুখে সেদিনের বিশ্বপ্রকৃতি আবার নূত করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীহভাবে বলিল, কবে গো?

বিষ্ণুরথ হাসিয়া বলিল, মনে নেই? তুমি এলে তোমার রাজপুত্র বরের খবর নিয়ে....

কাজলীর সমস্ত দুষ্টুমি ফাঁসিয়া গেল। লজ্জিতভাবে স্বামীর কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল, যাও।

—যাব তো। কিন্তু কোথায় গেল সেই রাজপুত্র বর?

তাহার পিঠে দুইটা কিল দিয়া কাজলী বলিল, এই তো, এইতো।

—সেদিন তোমার ভয় করেছিল, আজ করে না? যদি এখুনি দরজা বন্ধ ক'রে দিই?

কাজলী একথার আর উত্তর দিল না, শুধু হাসিতে লাগিল।

কিন্তু কাজলী আজ বিশেষ প্রয়োজনে বিষ্ণুরথকে উপরে ডাকিয়া আনিয়াছে। নহিলে এ বাড়ীতে দিবাভাগে স্বামীর উপরে আসার প্রথা নাই।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

তাহারও জরুরী কথা! বিষ্ণুরথ বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, দেওয়ালের সঙ্গে যে লোহার সিন্দুক গাঁথা আছে কাজলী চাবি দিয়া সেটা খুলিল। তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল একটা ছোট হাত-বাক্স। তারপর সিন্দুকটা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া হাত-বাক্সটা হাতে লইয়া বিষ্ণুরথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি ওটা?

—হাত-বাক্স। ধর।

হাত-বাক্সটা হাতে লইয়া বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, তারপর ?

—তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় কোরো।

বিষ্ণুরথের মাথার চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে কাজলী লিতে লাগিল, তোমার অনেক কাজে অনেক রকমে আমি বাধা দিই ত্যি। সে ভালো করি, কি মন্দ করি তুমিই জান। লোকের দুঃখে ামার কষ্ট হয় না সত্যি। তাই ব'লে তোমার কষ্টও সইতে পারি াই মনে কর ?

বিষ্ণুরথের বুঝিতে বাকী রহিল না ফতা মুদীর কথা যথাসময়েই াজলীর কাছে পৌঁছিয়াছে। উত্তর দিবার কিছু নাই। সে চুপ রিয়া রহিল।

কাজলী আবার বলিল, কথা দাও,—আমার গা ছুঁয়ে বল, কোনো ারণেই কারও কাছে মাথা নীচু করবে না ? না হয় সব যাবে। াছতলা আশ্রয় করতে এত ভয় ?

হাতবাক্সটা এক পাশে নামাইয়া রাখিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, কথা দিলাম। কন্তু তোমার হাতবাক্স রইল কাজলী, ওর প্রয়োজন হবে না।

তাহার নির্ভীক উজ্জ্বল চোখের দিকে চাহিয়াও তবু যেন কাজলীর িশ্বাস হইতেছিল না।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি দরকার হবে না ? কথা িলে তো ?

তাহার দুই কাঁধের উপর দু'খানি হাত রাখিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, কথা িলাম কাজলী, সত্যি দরকার হবে না।

কাজলীকে কথা দিবার দরকার ছিল না। বিষ্ণুরথ ইতিপূর্ব্বেই নঃস্থির করিয়াছিল। ফতেসিংহের টাকা যতই থাকুক, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ামাজিক পদমর্য্যাদায় সে অতি নগণ্য লোক। তাহার স্পর্দ্ধায় বিষ্ণুরথ

শুধুই যে বিস্মিত হইয়াছে তাহা নয়, মহৎ ভাবুকতায় দুই চোখ বুজিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া থমকিয়া থামিয়া গেল! যতই ভাবিয়া দেখে এই গ্রামের জনসাধারণকে দুঃখ ও দুর্দ্দশার হাত হইতে বাঁচাইতে গেলে কতখানি নামিতে হইবে ততই ভয়ে শিহরিয়া ওঠে। মনের মধ্যে আর বল পায় না।

বিষ্ণুরথ কোনো কালেই স্থিরবুদ্ধি অবশ্য নয়। মতের এবং মনের পরিবর্ত্তন হইতে তাহার দেরী হয় না। তথাপি তাহার চিত্ত বৃহৎ এবং প্রবৃত্তিও মহৎ। দুঃখবরণ করিতে সে ভয় পায় না। কিন্তু দুঃখ আর অপমান এক কথা নয়। যদি বুঝিত এই জমিদারী ত্যাগ করিলে প্রজারা বাঁচিয়া যাইত, তাহাতে সে দ্বিধা করিত না। এতটা মনের বল তাহার আছে। কিন্তু সে বেশ জানে, দুর্দ্দৈবে পড়িয়া যদি কোনো দিন জমিদারী তাহার হাতছাড়া হইয়া যায় প্রজাদের লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না। সে যদি বাঁচে, তবেই প্রজারা বাঁচিবে।

নীচে নামিয়া আসিয়া বিষ্ণুরথ হালদার মহাশয়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাসপাতালের খাতায় প্রজাদের কাছ থেকে কত চাঁদা আদায় হয়েছে?

হালদার মহাশয় নিরীহভাবে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, বোধ হচ্ছে এখনও কিছু জমা হয়নি। বোধ হচ্ছে....

ধমক দিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, বোধ হচ্ছে কেন? তাদের কি চাঁদা দেওয়ার কথা ছিল না? হাসপাতাল হ'লে সুবিধে কি একা আমার হবে?

হালদার মহাশয় বলিলেন, কি জান....

—কিছুই জানতে চাই না। আচ্ছা, হাসপাতালের চাঁদাটা বরং এখন থাক। বাকী খাজনাটা যতদূর সম্ভব আদায় ক'রে আষাঢ় আর

আশ্বিন কিস্তি ল্যাটের টাকা পাঠিয়ে দেওয়াই চাই। বুঝতে পারলেন ?

হালদার মহাশয় যেন আকাশ হইতে পাড়লেন। বলিলেন, প্রজারা না দিলে আমি কি করতে পারি ?

—আপনি সব করতে পারেন। নয়তো এতকাল ধ'রে শিখলেন কি ?

হালদার মহাশয় এবারে একগাল হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, কালকেও দিদিমণিকে সেই কথাই বলছিলাম ভায়া। বলছিলাম····

বিষ্ণুরথ হালদার মহাশয়ের কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না। ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিয়া গেল, আজকেও সেই কথাই বলবেন।

১৫

প্রজারা সমস্ত ব্যাপারটিকে প্রথমে রসিকতা বলিয়া মনে করিল। জমিদারের পাইক গেলে হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। তারপরে যখন খবর আসিতে লাগিল এ-পাড়া, ও-পাড়া, সে-পাড়া হইতে জন কয়েক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজাকে পাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তখন সকলে হাসি থামাইয়া গুম্ হইয়া ভাবিতে বসিল।

ত্রৈলোক্যবাবুর আমলে অত্যাচার-উৎপীড়ন অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু সে তাহাদের সহিয়া গিয়াছিল। মাঝখানে রাশ ঢিলা করিয়া আবার টানিয়া লওয়ায় লোকে উৎপীড়ন সম্বন্ধে এই প্রথম সচেতন হইল। পাড়ায় পাড়ায় ঘোট পাকাইয়া মীটিং বসিল, এবং বহু প্রকার জ্ঞাত,

অজ্ঞাত ও অনুমিত আইনের নজীর তুলিয়া সকলে স্থির করিল যে, অত্যাচার কিছুতে নীরবে সহ্য করা হইবে না।

রোখ ছোট পালজীরই বেশী। অন্যান্য সকলের মতো তাহার খাজনা তো আছেই, তার উপর কিস্তিবন্দির টাকা। আজ সকালে বিষ্ণুরথের হাতে পায়ে ধরিয়াও নিষ্কৃতি না পাওয়ায় রোখ আরও চড়িয়া গিয়াছে।

ছেলেদের দল বিশ্বাস করিল আরও পরে। পাড়ায় পাড়ায় যখন ঘোঁট চলিতেছিল তখনও তাহারা ব্যাপারটা ততটা গুরুতর মনে করে নাই। বিশেষ বিষ্ণুরথের বিরুদ্ধে কোনো কথা সহজে গ্রাহ্য করিতে তাহারা অভ্যস্ত নয়। কিন্তু হালদার মহাশয় যখন তাহাদের চোখের সামনে এক একজন প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া মায় সুদ ও বৃদ্ধি, তহুরী ও চেকের দাম আদায় করিয়া তবে ছাড়িতে লাগিলেন তখন তাহাদেরও টনক নড়িল।

স্বর্ণকারদের মহেশ, যাহার গামছার জল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের গায়ে লাগায় একদা বহু অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিষ্ণুরথের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক সঙ্গেই দুজনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। তারপর অর্থাভাবে মহেশ আর পড়িতে পারে নাই। সম্প্রতি ক্রোশ দুয়েক দূরের একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতেছে। স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকিলে দশ টাকা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া গ্রাম হইতেই যাওয়া আসা করে। বিষ্ণুরথের সঙ্গে আজও তাহার অন্তরঙ্গতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এখনও দুইজনে এক সঙ্গে একাসনে বসিয়া প্রায় প্রত্যহ দাবা খেলা করে। সে সদল বলে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল।

ডেপুটেশনের মহেশই মুখপাত্র হইলেও বিষ্ণুরথের আরও অনেক বন্ধু তাহার মধ্যে ছিল। বিষ্ণুরথ তাহাদের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া

গিয়া নিরিবিলি আপনার অবস্থা-সঙ্কটের কথা সবিস্তারে বিবৃতি করিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া শেষে স্রেফ হাঁকাইয়া দিল।

অপমানিত হইয়া মহেশের দল ক্রুদ্ধভাবে শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া গেল। মহেশ নিজে ইংরাজি লিখিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদের স্কুলের হেডমাষ্টারকে দিয়া খবরের কাগজে যে অবিলম্বে চিঠি পাঠাইবে ইহা একেবারে পাকা কথা।

সেই চেষ্টাই মহেশ করিতে লাগিল। সে সর্ব্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য একটা প্রকাশ্য জনসভার আয়োজনের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা। গ্রামের লোকেরা জনসভার মল্য বোঝে না। তাহার উপর অন্নচিন্তা এবং এই প্রকার আরও নানা ব্যাপারে এমন ব্যস্ত থাকে যে, শেষ পর্যন্ত সভায় উপস্থিত হইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিবে এমন ভরসা পাওয়া গেল না। অগত্যা তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘরোয়া বৈঠক বসিতে লাগিল।

এতদূর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। কিন্তু যেই হেডমাষ্টারকে দিয়া একখানা দরখাস্তের চোস্ত খসড়া করিয়া আনিয়া মহেশ তাহাতে স্বাক্ষর চাহিতে বাহির হইল অমনি লোকে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ফতেসিংহের কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য বিষ্ণুরথের লোক পাঠানোর সংবাদটা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ সকলকে বোঝাইতে লাগিল, বিষ্ণুরথের ভিতর ফাঁপা হইয়া গিয়াছে। নহিলে ফতেসিংহের কাছেও ঋণ চাহিবার প্রয়োজন হয়! ত্রৈলোক্যবাবু নাই। সিংহের চামড়া গায়ে চড়াইয়া বিষ্ণুরথ যত আস্ফালনই করুক, সকলে যদি একবার সাহস সঞ্চয় করিয়া তাহার চামড়াটা খুলিয়া দিতে পারে, সব গুমর ফাঁক হইয়া যাইবে। শুধু চাই খানিকটা সাহস। এবং এই তাহার সময়।

কিন্তু সমস্ত বুঝিয়াও লোকে লিখিত-পঠিত ব্যাপারের মধ্যে যাইতে চাহিল না। শতং বদ, মা লিখ। এই সমস্ত ছেলেদের উপর গ্রামের লোকের স্নেহের অন্ত নাই। জানে ইহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা নাই অসাধুতা নাই, ভয়ের বালাই নাই। যথেষ্ট স্নেহ আছে, তবু কিছুতে বিশ্বাস করিতেও পারে না। এক পুরুষের মধ্যে কেমন করিয়া যেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রটি হারাইয়া গিয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষার জন্য হোক অথবা অন্য কোনো কারণের জন্যেই হোক, ইহারা যেন কোনো এক অপরিচিত বায়ুমণ্ডলের জীব। সেখানে উহাদের নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। ছেলেদের উদ্দেশ্য সাধু, সকলে তাহাদের সাফল্য কামনা করে, উৎসাহও দেয়, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের ছেলেকে ইহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে যত্নবান।

সুতরাং মহেশের দল শেষ পর্য্যন্ত হালদার মহাশয়ের কূট বুদ্ধির সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। প্রথমত গ্রামের লোকের একতা ভাঙিয়া গেল। বড়পালজী ইতিমধ্যেই হালদার মহাশয়ের কাছে আসিয়া স্বেচ্ছায় তাহার সমস্ত বাকী খাজনা মিটাইয়া দিয়া গিয়াছে, এবং হালদার মহাশয়ের কাছারীর সান্ধ্য বৈঠকের নিয়মিত সভ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাবুদের তো কথাই নাই, তাহাদের দাপেই পাল-পাড়ার লোকে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে তন্তুবায়দের সঙ্গে সাহাদের নালার সেচ লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল তাহাতে হালদার মহাশয় তন্তুবায়দের পক্ষে রায় দিয়া তাহাদের দলে টানিয়া লইয়াছেন। তাহারাও দল-কে-দল কেহ ঘর হইতে, কেহ বা কর্জ্জ করিয়া খাজনা তো মিটাইয়া দিয়াছেই, অধিকন্তু প্রয়োজন পড়িলে লাঠি লইয়া সাহায্য করিবার ভরসাও দিয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে হালদার মহাশয় প্রত্যেক পাড়ার অর্দ্ধেক লোককে নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইলেন। তখনও পর্য্যন্ত

মহেশ এত বড় গ্রামখানার মধ্যে দশটির বেশী নাম-সই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এমন সময় এরূপ একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল যাহা মহেশ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই ঃ

মহেশের পিতা রাধিকা স্বর্ণকার পুত্র কৃতবিদ্য হওয়ার পরেও জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে পারে নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, মহেশের উপার্জ্জন তাহার পিতার উপার্জ্জনের কাছে কিছুই নয়। লোকে বলে, লোকটা টাকা জাল করিতে সিদ্ধহস্ত,—তাহার তৈরী টাকা সাধারণ লোকের সাধ্য নাই যে ধরে। কিন্তু এ সকল কথার কোনো প্রমাণ নাই। আসলে সোণার দাম চড়িয়া যাওয়ার পরে অলঙ্কার তৈরী কমিলেও সোনার খরিদ-বিক্রি ব্যবসা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। রাধিকার হাতে যদি দু'পয়সা জমিয়া থাকে, তাহা এই ব্যবসায়ের কল্যাণে জমা বিচিত্র নয়।

তখন সবে সকাল হইয়াছে। রাধিকা প্রতিদিনের মতো তাহার ক্যাম্বিসের ব্যাগটা লইয়া কেবল বাহির হইয়াছে এমন সময় জমিদারের পেয়াদার তলব আসিল। রাধিকা এত সকালে এমন একটা অপ্রিয় আহ্বানে হতচকিত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল! কিন্তু তাহাকে কোনো কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই পেয়াদারা এক রকম হিড় হিড় করিয়া কাছারীতে হাজির করিল।

মহেশের তখনও ঘুম ভাঙে নাই।

পাঁচ জনের চেঁচামেচিতে মহেশের ঘুম ভাঙিল। সমস্ত শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। বুঝিল বিষ্ণুরথের জেদ চড়িয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িবে না। তাহার পাইক আছে, পেয়াদা

আছে, লোক জন অনেক আছে। তাহার হাতে ছেলের দ থাকিলেও জোর করিয়া বাবাকে কাছারী হইতে বাহির করিয়া আনি সে শক্তি নাই। যাহারা সহানুভূতি জানাইতে আসিয়াছিল তাঁহার থানায় সংবাদ দিবার পরামর্শ দিল। মহেশেরও এ পরামর্শ সমীচী মনে হইল। বরং কতকটা উৎসাহিতই হইয়া উঠিল। পুলিশ আনিয় বিষ্ণুরথের বাড়ীতে হানা দিতে পারিলে বিষ্ণুরথ জব্দ হইয় যাইবে।

মহেশের বাড়ীর ভিতরে মেয়েরা তখন ডাক ছাড়িয়া কান্না আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া মহেশ মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিয় ছেলের দল লইয়া থানায় চলিল।

ছয় মাইল দূরে থানা। মাঝে একটা বিল, তারপরে একটা গ্রাম আবার একটা মাঠ, তারপরে থানা। ভাদ্রের চন্‌চনে রোদ। সমস্ত পথে এতটুকু ছায়া নাই। উৎসাহ ও উত্তেজনার আধিক্যে একট ছাতা পর্য্যন্ত লইতে সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। বিল ভাঙিয়া, মাঠ পার হইয়া যখন ঘণ্টা দুই পরে তাহারা থানায় পৌছিল তখন বেলা নয়টার কম নয়।

গিয়া শুনিল, বড় দারোগা ছোটদারোগা দুইজনেই কাল সন্ধ্যার সময় সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছেন এখনও ফেরেন নাই। কেবল একজন লেখাপড়া-জানা কনষ্টেবল থানায় আছে।

তিনকড়ি ইহাদের মধ্যে বয়সে ছোট হইলেও মাতব্বর ব্যক্তি। সে সিপাহীকে সসম্ভ্রমে সেলাম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহারা কখন ফিরিবেন।

সিপাহীজি বারান্দায় একখানা চারপাইএ বিশাল বপু বিছাইয়া শুইয়া ছিল। সেলামের পর উঠিয়া বসিল।

হাই তুলিয়া বলিল, আজভি ফিরতে পারেন, কালভি ফিরতে পারেন। পুলিস কা কাম !

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হতাশভাবে সেইখানে বসিয়া পড়িল। এতটা পথ এই রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়া সকলের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঝর ঝর ঘাম ঝরিতেছে। ঘামে ভিজিয়া গায়ের জামা সপ্ সপ্ করিতেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। ছয় মাইল পথ ভাঙিয়া আসিয়াছে, এখন শুনিল তুইজন দারোগার একজনও নাই,—আজও আসিতে পারেন, কালও আসিতে পারেন।

সিপাহীজি ভুঁড়িতে হাত বুলাইয়া জানাইল, চারিদিকে ভারি ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে। দারোগাবাবুরা নাওয়া-খাওয়ার সময় পাইতেছেন না। এক জায়গা হইতে ফিরিয়া আসিতে না আসিতে দোসরা জায়গা হইতে ডাক আসিতেছে।

মহেশ হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তাহ'লে ?

সিপাহী গোঁফে চাড়া দিয়া বলিল, হামি তো আছে, রাইটার বাবুভি আছে। ডর কি ? চুরি, না ডাকাতি ?

মহেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, আমার বাবাকে জমিদারে ধ'রে নিয়ে গেছে। পুলিশের সাহায্যে আমি তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে চাই। আপনাকে এখনি একবার যেতেই হবে।

সিপাহীজি উঠিতেছিল, আবার বসিয়া পড়িল। ডাকাত নয়, চোরও নয়, জমিদার। জমিদারদের সঙ্গে পুলিশের যথেষ্ট সদ্ভাব। সিপাহীজি দীর্ঘকাল পুলিশে চাকরী করিয়া এটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে যে, এ সমস্ত ব্যাপার হাতে না লওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মহেশ আবার হাত যোড় করিতেই ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলিল, হামকো

পাশ কেয়া? হামি একেলা কেতোদিক সামলাইবে? যাও না, উধার রাইটার বাবু হায়, উন্‌কো পাশ যাও না!

মহেশ অগত্যা রাইটারবাবুর কাছে গেল। সে ডায়ারীতে তাহার অভিযোগ লিখিয়া লইয়া আশ্বাস দিল দারোগাবাবু ফিরিলেই তাঁহাকে ওকুস্থলে পাঠাইয়া দিবে।

কিন্তু কবে? কখন? ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার বাবা কাছারী বাড়ীতে অনাহারে আটক থাকিবে? অথচ উপায়ও নাই। দারোগা না ফেরা পর্য্যন্ত রাইটার কনষ্টেবলের থানা ছাড়িয়া এক পাও নড়িবার উপায় নাই।

এই সমস্ত যখন শেষ হইল তখন বেলা এগোরোটা, কি তারও বেশী। সঙ্গে পয়সাও বেশী আনে নাই। পাশের দোকানে গিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বারোটার সময় মহেশের দল থানা হইতে বাহির হইল। কিন্তু পথ চলিতে আর পারে না। চন্‌চনে রোদে মাথা তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ছয় মাইল পথ ষোল মাইল হইয়া উঠিল। টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে কোনো রকমে বিলটাও অতিক্রম করিল। কিন্তু যখন আর মাত্র মাইল খানেক পথ অবশিষ্ট আছে তখন পথিপার্শ্বের আমবাগানে বিশ্রামের জন্য বসিল। বসিল, একটু পরেই ঘাসের উপর গড়াইয়া লইল, এবং দেখিতে দেখিতে কখন যে ঘুমে ঢলিয়া পড়িল জানিতেও পারিল না।

বাগান স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল। ঝির ঝির করিয়া চমৎকার হাওয়া দিতেছে। তাহাতে ঘুম আসে বটে, কিন্তু ক্ষুধা দূর হয় না। ক্ষুধায় ঘুম ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তখন বেলাও আর নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কোনোপ্রকারে বাড়ী ফিরিল।

তখন মহেশের বাড়ীর সামনে বহু লোকের ভিড়।

মহেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বিষ্ণুরথ যত ভালোই হোক, তাহার

যে প্রকার জেদ চড়িয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।

পা চালাইয়া আর একটু আগাইয়া আসিতেই নজরে পড়িল, ক্ষুদুবালা বৈষ্ণবীর পোড়ো বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড বড় ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে, আর ভূষণ চৌকিদার তাহার দড়িটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিয়াই তিনকড়ি হাতে তালি দিয়া বলিল, নিশ্চয়ই দারোগা এসেছে।

খুব সম্ভব তাই। নহিলে এত বড় ঘোড়া এদিকে আর কাহারও নাই। তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন শরীর লইয়াও একপ্রকার ছুটিয়া চলিল।

দারোগাই বটে। মহেশেরা চলিয়া আসিবার আধ ঘণ্টা পরেই দারোগাবাবু ফিরিয়া আসেন। রাইটারবাবুর কাছে মহেশের অভিযোগ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। একে তিনি ঘোড়ায় আসিয়াছেন, তাহার উপর মহেশেরা আমবাগানে বেশ একদফা নিদ্রা গিয়াছে, কাজেই তাহাদের আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ওদিকে মহেশও মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া চলিয়া গেল, এদিকে মহেশের মাও বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিল। প্রথমে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তারস্বরে গালি দিয়া বিষ্ণুরথ ও তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া ক্লান্ত ভাবে হাঁপাইতে লাগিল। শেষে উত্তেজনার প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে বাবুদের অন্দরের দিকে চলিল।

সেখানে কাজলী তাহার সঙ্গে দেখাই করিল না। দেখা হইল ঝিদের সঙ্গে। তাহারা আবার গৃহিণীর উপর দিয়া যায় মহেশের মাকে

এমন কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল যে বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইবার পথ পাইল না। বিষ্ণুরথের সঙ্গেও দেখা হইল না। দেখা হইল হালদার মহাশয়ের সঙ্গে। আর দেখা স্বামীর সঙ্গে। তাহাকে উঠানের একটা আম গাছে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। দেখিয়া মহেশের মা কাঁদিয়া আর বাঁচে না।

রাধিকা দম ধরিয়া বসিয়াছিল। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার হীন অবস্থা স্ত্রীর প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় পৌরুষ জাগিয়া উঠিল। দাঁত বাহির করিয়া ধমক দিয়া বলিল, এঃ! মড়া কান্না কাঁদতে এলেন! যা, আমার বড় সিন্দুকের মধ্যে থেকে দুখানা দশ-টাকার নোট নিয়ে আয়। এই নে চাবি।

মহেশের মা চাবি কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিল।

পিছন হইতে রাধিকা আবার সাবধান করিয়া দিল, খবর্দ্দার বেশী নিস না যেন। একটা পয়সা এদিক-ওদিক হ'লে তোমার হাড়-মাস একত্র রাখব না। শুনলি?

মহেশের মা শুনিল কিনা বুঝা গেল না। রাধিকাও চাবিটা তাহার হাতে দিয়া অস্বস্তিতে বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল আধ ঘণ্টা পরে মহেশের মা দুখানি নোট আর চাবির গোছা স্বামীর কাছে ফেলিয়া দিয়া আবার পিছন ফিরিয়া কাঁদিতে বসিল।

রাধিকা টাকা দিয়া চেক লইল। হালদার মহাশয় কড়কাইয়া দিলেন, শুনলাম তোমার ছেলে থানায় পুলিশ আনতে গেছে। যদি হাঙ্গাম কিছু বাধে তার সমস্ত খরচ তোমার কাছ থেকে আদায় হবে। মনে থাকে যেন।

রাধিকা হাত জোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে, সে ছেলেমানুষ কি

করতে কি করছে তাও জানি না। কিন্তু আমি কি সেই রকম লোক ?

রাধিকা চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় স্ত্রীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

রাধিকা ফিরিয়া আসিতেই তাহার হিতৈষীর দল তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ছেলে যখন জমিদারবিরোধী দলের নেতা তখন, অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, অত সহজে খাজনা—মায় সুদ, বৃদ্ধি, বাব এবং জরিমানা,—দিয়া আসা ঠিক হয় নাই।

কিন্তু রাধিকা যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল, তা খাজনা পাবে, দিতে হবে না ?

লোকেরা তাহার মুখের উপর হাত [illegible]ড়িয়া বলিল, দিতে হয় কোর্টে গিয়ে দিতে। জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবার আইন নেই !

—হুঁ।

বিরক্ত ভাবে শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া রাধিকা অনেকক্ষণ পরে তামাকে মনোনিবেশ করিল। হিতৈষীর দল তাহাকে ঘিরিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে আর রাম কি গঙ্গা একটা কথাও বলিল না। গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর দারোগা-পর্ব্ব।

মহেশের জন্য বাড়ীর লোকেরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল। সে আর আসেই না, আসেই না।

রাধিকা বিরক্ত হইয়া বলিল, দে আমার ভাত দে ! আর কতক্ষণ ওর জন্যে বসে থাকব। বেলা আর আছে না কি !

বাড়ীর মেয়েরা ভাত কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা

আহারাদি সারিয়া, এক কলিকা তামাক সাজিয়া বাহিরে আসি বসিয়াছে এমন সময় একটা বড় ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগার আবির্ভাব।

—এইটে রাধিকা স্বর্ণকারের বাড়ী ?

রাধিকা তাড়াতাড়ি হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া রাস্তা নামিয়া দাঁড়াইল। করযোড়ে বলিল, হ্যাঁ, হুজুর।

—কোথায় সে ?

রাধিকার বুক হইতে তালু পর্যান্ত ভয়ে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল দারোগার প্রশ্নের উত্তর সে যেন কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিকে চাহি রাধিকাকেই অন্বেষণ করিল।

তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল, আমিই, হুজুর।

দারোগা টপ্ করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে ভিড় জমিয়া গেল। কোথা হইতে কে একজন একটা টুল লইয়া আসিল একজন চৌকিদারও খবর পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থি হইয়াছে। দারোগা ঘোড়ার লাগামটা তাহার হাতে দিয়া টুলে উপবেশন করিলেন।

হ্যাঁ, দারোগা বটে! যেমন লম্বা, তেমনি মোটা। মি কালো জোয়ান। গোঁফ জোড়াকে মোম দিয়া মাজিয়া প্রা ভাগ সূক্ষ্ম করিয়া আকাশের দিকে ঠেলিয়া তোলা লইয়াছে। গো গাল ভাঁটার মতো চক্ষু স্বভাবতই রক্তবর্ণ। আর তেমনি ভারি ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর। সমবেত সকলে দারোগা দেখিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া গেল। বুঝিল আর ভয় নাই।

দারোগা ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি থানায় লোক পাঠিয়েছিলে ?

রাধিকা তখনও নীচে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুর্গানাম জপ

করিতেছিল। তার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। শুধু নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দারোগা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। সমবেত লোকেরা অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল। কেবল রাধিকার মুখভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না। দারোগা অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া ডায়ারীর পাতা উলটাইতে লাগিলেন।

—এই যে, মহেশ চন্দ্র পাত্র।

দারোগা নামটা জোরে জোরে পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহেশ কার ছেলে? তোমার?

ভুলিয়া ভুলিয়া রাধিকা এবারও ঘাড় নাড়িল।

সমবেত জনতা প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপরে জোরে জোরে হাসিয়া উঠিতেই রাধিকা থতমত খাইয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমারই ছেলে।

দারোগার চেহারা যেমনই হোক, ভিতরে ভিতরে বেশ রসিক লোক। ভাটার মতো চোক পাকাইয়া ধমক দিলেন, ঠিক তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—তুমি তাকে থানায় পাঠাও নি?

—আজ্ঞে না হুজুর।

দারোগা থামিলেন। রোষকষায়িতলোচনে কিছুক্ষণ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে বিষ্ণুরথবাবু ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে না হুজুর।

—বে-আইনি ভাবে আটক রাখেন নি? ভয় কি? সত্যি বল।

—আজ্ঞে না, হুজুর।

সমবেত জনতার অধিকাংশ লোকই মজা দেখিতে আসিয়াছিল।

তাহারা ছাড়া অন্য লোকে রাধিকার নির্ব্বুদ্ধিতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। দারোগা এক ধমক দিতেই চুপ করিল।

রাধিকা তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, ধ'রে নিয়ে যাবে কেন, ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। জমিদার খাজনা পাবে, নিয়ে যাবে না?

বলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাত নাড়িয়া, ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো দাঁত বাহির করিয়া এমন মুখ ভঙ্গি করিল যে, দারোগার পক্ষেও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মহেশ কোথায়?

রাধিকা রাগিয়া বলিল, যমের বাড়ী গেছে।

—ফেরে নি?

রাধিকা ঘাড় নাড়িল।

এমন সময় হন্তদন্তভাবে মহেশ ভিড় ঠেলিয়া দারোগার সামনে আসিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, এই যে আপনি এসেছেন। আমিই থানায় গিয়েছিলাম। আমার বাবাকে....

দারোগা এক ধমক দিলেন, মিথ্যা কথা।

মহেশ তৎক্ষণাৎ গলা চড়াইয়া জবাব দিল, Certainly not.

রাধিকা স্বর্ণকারের ছেলের মুখে ইংরাজি কথা শুনিয়া দারোগা হতচকিত হইয়া গেলেন। কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

মহেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিল, আচ্ছা আমিই না হয় মিথ্যে বলছি। কিন্তু এই যে এত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, এরা তো দেখেছে। এরাই বলুক না।

—কি হে?

বলিয়া দারোগা ভিড়ের দিকে চাহিতেই ভিড় নিরুত্তরে পিছু হটিতে লাগিল। দূর হইতে কে একজন বলিল, তোমার বাবা নিজেই

অস্বীকার করছে, আর আমরা পাড়া-প্রতিবেশী, আমরা জানি? বেশ!

দারোগা মহেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওই তো।

মহেশ চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার ঠিক ডান দিকেই যে তাহার বাবা দাঁড়াইয়া আছে উত্তেজনার আধিক্যে সেদিকে লক্ষ্যই পড়ে নাই। হঠাৎ তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মহেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এই যে বাবা! বল তো কি হ'য়েছিল?

রাধিকা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর পনেরো মিনিট ধরিয়া পিতাপুত্রে কি কাণ্ডই না হইল। মহেশ প্রথমে পিতাকে সত্য কথা বলাইবার জন্য অনুনয়-বিনয়, কান্নাকাটি করিল। আত্মহত্যা করিবার ভয় পর্যন্ত দেখাইল। অবশেষে ক্রোধে ও অপমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মুখে যা আসিল বলিতে লাগিল। কিন্তু দারুব্রহ্মের মতো রাধিকা সেই যে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে মহেশ ভালো মন্দ একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না। বলির পশুর মতো রাধিকা কেবল থাকিয়া থাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপে, আর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়ে।

দারোগা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি একবার বাবুদের ওখানে চললাম।

মহেশের দিকে চাহিয়া বঙ্কিম হাস্যে বলিলেন, পুলিশকে মিথ্যে খবর দিয়ে আনলে কি হয় জান? ইংরিজি তো খুব কপ্‌চাচ্ছিলে!

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবর্তে পড়িয়া মহেশও যেন দমিয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, না স্যার।

—পুলিশ-হয়রানির দায়ে পড়ে।

মহেশ চুপ করিয়া রহিল।

বাবুদের বাড়ী দারোগার বিশেষ পরিচিত। তিনি ঘোড়ার চাবুকটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই দিকে গেলেন। থানায় বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে রাত্রিটা সেইখানেই কাটাইতে পারেন।

১৬

শেষপর্য্যন্ত মহেশ আর পুলিশ হয়রানির দায়ে পড়িল না। বিশেষ কাজ না থাকায় দারোগাবাবু বিষ্ণুরথের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না। রাত্রিটা এইখানেই থাকিয়া গেলেন। সেই রাত্রে অনেক কচলাকচলির পর রাধিকা কি করিয়া দারোগার ক্রোধ শান্তি করিল কেহই জানে না।

এই একটি কাণ্ডে গ্রাম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। প্রজারা থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়া, যাহার দুই মুঠা ধান তখনও ছিল সে ধান বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা মিটাইয়া দিল। র কথাটি কহিল না।

এই কাণ্ডের ফলে আরও একটা পরিবর্ত্তন আসিল। গ্রামের লোকের সঙ্গে সমভাবে মেলামেশা এবং জাতিবর্ণমর্য্যাদানির্ব্বিশেষে বন্ধুজনের সঙ্গে খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, উঠাবসার জন্য এতদিন বিষ্ণুরথ জমিদার হইয়াও জমিদার হইতে পারে নাই। এই ঘটনার পর হইতে সে আপনাকে প্রজাসাধারণের নিকট হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া

ফেলিল। যখন-তখন যার-তার বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। এবং তাহার কাছে কেহ আসিলে এমনভাবে আলাপ করিতে লাগিল যে, তাহার প্রাক্তন বন্ধুবর্গ এতদিনের বন্ধুত্বের কথা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইয়া গেল।

এখন যাহারা তাহার কাছে আসিতে লাগিল তাহাদের আর ঠিক বন্ধু বলা চলে না, মোসাহেব বলাই সঙ্গত। ইহারা হাসপাতাল কেমন করিয়া চালাইলে ভালো হইবে সে আলোচনা করে না। যে-অঞ্চলে একটাও হাসপাতাল নাই সেখানে যে এত বড় এক হাসপাতাল খুলিতে পারে সে কত বড় লোক তাহাই আলোচনার বস্তু। বিষ্ণুরথ ধীরে ধীরে ইহাদের সাহচর্যে অভ্যস্ত হইয়া ন। অবশ্য মোসাহেব প্রতিপালন ব্যাপারটা একটু ব্যয়সাধ্য। ত হোক। বিষ্ণুরথ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নয়।

হালদার মহাশয় বাঁচিয়া গিয়াছেন। আবার আগের মতো চুটাইয়া জমিদারী চালাইতেছেন। ত্রৈলোক্যবাবু নিজে জমিদারীর কাজে পোক্ত ছিলেন। সেজন্য ছোট-খাটো সকল ব্যাপারে হালদার মহাশয়ের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিলেও উপরি উপার্জ্জনে বাড়াবাড়ি করিতে সাহস হইত না। আর বড় বড় ব্যাপার তো খাস কর্ত্তারই হাতে থাকিত। কিন্তু বিষ্ণুরথ যেন সাধারণের উপর রাগ করিয়াই সমস্ত ভার হালদার মহাশয়ের উপর ছাড়িয়া দিল। হালদার মহাশয় নিজে না আসিবার প্রয়োজন বোধ করিলে বিষ্ণুরথ নিজে হইতে তাঁহাকে জমিদারী সংক্রান্ত কাজে ডাকিয়া পাঠায় না।

কাজলীও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। অর্থের জন্য বিষ্ণুরথ প্রায় সব সময় চিন্তিত হইয়া থাকিত। সন্দেহ ছিল, তাহার বদান্যতা ও দেশসেবা কাজলী ততটা পছন্দ করে না। সেই ভয়ে মনের দুঃখ তাহার

কাছে প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। কাজলী তাহা বুঝিত, ত
স্বামীকে প্রশ্রয় দিত না। এখন অর্থাভাবের চিন্তা অনেকটা দূ
হইয়াছে। কিছু দুশ্চিন্তা যদি থাকেও সে ভার এখন হালদার মহাশয়ে
উপর। হালদার মহাশয় বিশেষ প্রয়োজন বুঝিলে বরং কাজলীর সঙ্গে
পরামর্শ করেন তবু বিষ্ণুরথের কাছে যান না।

বিষ্ণুরথ চিরকাল বন্ধুবৎসল। পিতার মৃত্যুর পর যখন সে জমিদারী হাতে লইল, তখন একসঙ্গে এত কাজ আসিয়া জুটিল যে, প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন নানা কাজে ছুটাছুটি করিতেই কাটিয়া যাইত। আরাম করিয়া মজলিস জমাইবার সময় কাহারও ছিল না। নূতন বন্ধুদলের অফুরন্ত অবকাশ। জমিদারীর বোঝা হালদার মহাশয় টানিয়া লওয়ার পর বিষ্ণুরথেরও বাধাহীন ছুটি মিলিয়াছে। এখন দিবারাত্র জোর মজলিস চলে।

প্রথম প্রথম ইহাদের অত্যাচারে কাজলী বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়তো বেলা দশটার সময় বাহির হইতে চায়ের ফরমাস আসিল। পুকুরে মাছ ধরানো হইয়াছে। একটার সময় খবর আসিল দশজন বন্ধু দিনের বেলায় এখানে খাইবে। বিকালের দিকে হয়তো একটু মেঘ করিয়া আসিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে সুরু করি[illegible]ছে, হুকুম আসিল খানকয়েক পাঁপর-ভাজা, কয়েক বাটি চা অবিলম্বে [illegible]ই। সন্ধ্যায় গান-বাজনার মজলিস বসে। পানের ফরমাস তো মিনিটে মিনিটে। যেদিন বাড়ীতে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সেদিন গান-বাজনার পরে অর্থাৎ রাত্রি একটার সময় সকলে এইখানেই নৈশভোজনটাও সারিয়া যায়। শেষে কাজলীও আর পারিল না। সে এই গ্রামেরই মেয়ে,—অত লজ্জা নাই। একদিন চাকর দিয়া রীতিমত শুনাইয়া দিল। কিন্তু বন্ধুদের ভালো বলিতে হইবে, তাহারা এই অপমান যথেষ্ট ঔদার্য্যের

সঙ্গে গ্রহণ করিল। কেবল বিষ্ণুরথ মনে মনে লজ্জিত হইল। কাজলীর অবস্থা মনে মনে বুঝিয়া তাহাকেও কিছু বলিতে সাহস করিল না। কলিকাতা হইতে একটা ষ্টোভ, কয়েকটা স্পিরিটের বোতল, কিছু চা ও চায়ের বাটি আনাইয়া লইল। বন্ধুরাও আর কাজলীকে বিরক্ত না করিয়া যাহা খুশী নিজেরাই বাহিরে তৈরী করিয়া লইতে লাগিল। খরচ কিছু বাড়িল বটে, কিন্তু সেটা আর কাজলী তেমন গ্রাহ্য করিল না। হালদার মহাশয়ও আপত্তি করিলেন না।

আগে যে ছোট ঘরটায় বিষ্ণুরথ আফিস করিত সেটা এখন প্রায় অব্যবহার্য্য পড়িয়া আছে। ঘরটা নিতান্ত ছোট না হইলেও চেয়ার টেবিলে মজলিসের সুবিধা হয় না। সেজন্য তাহারই পাশের বড় হল ঘরটায় ফরাস পড়িয়াছে, আর গোটা কয়েক তাকিয়া। দিন রাত্রির মধ্যে এমন সময় নাই যখন কেহ না কেহ সেখানে তাকিয়া ঠেস দিয়া পড়িয়া না থাকে। তাহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিষ্ণুরথের নিজের উপস্থিত থাকার কোনো প্রয়োজন নাই। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত হলঘর খোলাই থাকে। মোট কথা বিষ্ণুরথের সমবয়সী গ্রামের যতগুলি ব্রাহ্মণ সন্তান বাল্যে লেখাপড়া ছাড়িয়া সময় কাটাইবার জন্য সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের সকলেরই এখানে আশ্রয় মিলিয়াছে, সময় কাটাইবার দুর্ভাবনারও অবসান হইয়াছে। প্রবীণেরাও এতদিন পরে গ্রামে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মর্য্যাদা পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

রাত্রি তখন বারোটার বেশী নয়।

কাজলী সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া, সকলকে খাওয়াইয়া-

দাওয়াইয়া স্বামীর খাবার শয়নকক্ষের এক পাশে ঢাকা দিয়া রাখিল। আজকাল গানের মজলিস একটার আগে তো ভাঙেই না, প্রায়ই আরও বেশী দেরী হয়। সে বিছানায় শুইয়া একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু এ গরমে বই পড়া অসম্ভব। হাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজলী সামনের খোলা বারান্দায় একখানা শীতল পাটি বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আলোটা আনিতে ভালো লাগিল না। সে চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। আকস্মাৎ মনে হইল কে যেন চুপি চুপি তাহার পাশে আসিয়া বসিল। চকিতে চমকিয়াই সে হাসিয়া উঠিল।

—এরই মধ্যে চলে এলে যে! তোমাদের গান তো এখনও ভাঙেনি।

বিষ্ণুরথ আরও কাছে সরিয়া আসিল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, গান ভাঙে নাই।

তাহাকে ভালো করিয়া বসিতে দিবার জন্য কাজলী আর একটু সরিয়া গেল। বলিল, তবে এরই মধ্যে এলে যে!

—ভালো লাগল না।

কাজলী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমাকে খুঁজবে না?

তাহার মাথার দিকে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া উপেক্ষার সঙ্গে বিষ্ণুরথ বলিল, না।

—ওকি! ওখানে শুলে কেন? খাবে না এখন?

বিষ্ণুরথ আরও ভালো করিয়া শুইয়া বলিল, না। শোনো, অনুভা একখানা চিঠি দিয়েছেন।

কাজলী বিস্মিতভাবে বলিল, সে আবার কে?

—অনুভা গো, অনুভা দত্ত। সেই হাজারিবাগে দেখা! এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

অনুভার সম্বন্ধে কাজলীর দুর্বলতা জাগিয়া উঠিল। অনুভা তাহাদের বাসায় খুব কমই আসিত, পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয় নাই। তাহার নামটাও ভালো করিয়া জানিত না, দত্তসাহেবের মেয়ে বলিয়াই জানিত। অনুভার প্রসঙ্গ উঠিতেই কাজলীর উৎসাহ নিবিয়া গেল।

শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, কি লিখেছেন?

—আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

—বিয়ের?

বিষ্ণুরথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, বিয়ে কি গো! ওঁরা বেড়াতে বেড়াতে এখন কুম্ভকোনমে পৌঁছেছেন। জায়গাটা নাকি খুব ভালো লেগেছে, কিছুদিন থাকবেন। তাই।

কাজলী শুধু বলিল, ও!

একটু পরে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বিয়ে হয়নি ওঁর?

—কি জানি।

তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া কাজলী অসহিষ্ণুভাবে বলিল, কি জানি আবার কি! তোমার সঙ্গে অত ভাব, তুমি জান না?

অন্যমনস্কভাবে বিষ্ণুরথ বলিল, বোধ হয়—হয়নি। কি হ'তেও পারে,—বিধবা। জিগ্যেস করিনি কোনোদিন।

দুইজনে কিছুক্ষণ আলোকিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, যাবে

—আমি? বেশ!

বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি বলিল, না, না। আমি এখনই যাওয়ার কথা বলছি না। মা এলে তারপর। তারও তো আর দেরী নেই।

কাজলী হাসিল। বলিল, মা এলেই আমার ছুটি হবে ভেবেছ? মৃত্যুর আগে এ বাড়ী থেকে আমার ছুটি নেই। মা এলে কাজ আরও বাড়বে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, আমার তো আর ভালো লাগে না কাজলী। পালাতে পারলে বাঁচি। এই ক'মাসেই হাঁপিয়ে উঠেছি।

—কি হ'ল?

অসীম বিতৃষ্ণায় উঠিয়া বসিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, ছাই, ছাই! নিজের ওপরও ঘেন্না ধ'রে গেল, মানুষের ওপরও ঘেন্না ধ'রে গেল!

বিষ্ণুরথের মনের দুঃখ কাজলী জানে। যাহাদের ভালো করিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রতিদানে আঘাত করিয়াছে। বিবিধ চাটুবাক্যে যাহারা তাহাকে দিনরাত্রি সঙ্গ দিতেছে, তাহারা তাহার দিনরাত্রির পবিত্রতাকে ক্রমেই কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। কাজলী সমস্ত জানে। মলিন মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিষ্ণুরথ বলিল, তাই ভাবছি কিছুদিন ঘুরেই আসি। দত্তসাহেবের সঙ্গ আমার বড় ভালো লাগে।

কাজলী ঈষৎ উত্তেজিতভাবে তাহার কাপড়ের প্রান্ত টানিয়া ধরিল। বলিল, না।

তাহার উত্তেজনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণুরথ অবাক
া গেল।

কাজলী বলিল, তুমি অন্য কোথাও যেতে চাও যেও। কিন্তু
ানে নয়।

বিষ্ণুরথ তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, জায়গাটা ভালো।
াপর দত্তসাহেব রয়েছেন····

কাজলী বিদ্রূপে বিষ মিশাইয়া বলিল, তার ওপর তাঁর মেয়ে রয়েছেন····

বিষ্ণুরথের কাছে এতক্ষণে সব পরিষ্কার হইল। কাজলী যে মনে
। এই পাপ এতদিন ধরিয়া পোষণ করিতেছে ভাবিয়া তাহার মন
ৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া গেল।

কাজলী তাহার দুটি হাত ধরিয়া বলিল, তুমি যাই কেন না বল, ও
ায় কখনই ভালো নয়।

বিষ্ণুরথ বারুদের মতো ফাটিয়া পড়িল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো
ত সরাইয়া লইয়া বলিল, ছি! তুমি এত নীচু!

—না, না! হয়তো ভালো। কিন্তু ওকে আমার বড় ভয় হয়।
ম রাগ করছ, কিন্তু···

কাজলী কথা শেষ করিতে পারিল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়া
াপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিষ্ণুরথ অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

রর দিন সকালে।

বিষ্ণুরথের উঠিতে একটু বেলা হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের বড়
-ঘরে তখন দাবা পড়িয়াছে। দুইজন খেলিতেছে, আর বাকী সকলে

একটা না একটা পক্ষে চাল বলিতেছে। উঁকি দিয়া একবার দেখিয়াই বিষ্ণুরথের আর ঘরে যাইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়াছিল, তাহাতেই উপবেশন করিল।

ওদিকের বারান্দায় কর্ম্মচারীরা দুইজন নিরীহ প্রজাকে লইয়া কি যেন একটা গুরুতর ব্যাপারের দর কষাকষি করিতেছিল। বিষ্ণুরথকে বাহিরে বসিতে দেখিয়া তাহারা হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহারা দেখিল বিষ্ণুরথের ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, তখন অগত্যা ইঙ্গিতে প্রজা দুইজনকে ভিতরে ডাকিয়া লইল। ব্যাপারটা সে দেখিয়াও দেখিতে চাহিল না।

পূজার আর বেশী দেরী নাই। সকালের সোনালি রোদে তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোণের শিউলী গাছের নীচেটা অজস্র ঝরা ফুলের রাশিতে শাদা হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একতারার ঝঙ্কারে বিষ্ণুরথ চমকাইয়া উঠিল।

—বাবু মশায়কে একটা গান শুনিয়ে দি।

একজন বাবাজি। রংটা মাজা কালো। দীর্ঘ দেহ, মাংসল না হইলেও হাড় বেশ মোটা। গায়ে শত তালিযুক্ত বিচিত্র বর্ণের বহির্ব্বাস পায়ের গোছ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। চুল ও দাড়ি গেরো দিয়া বাঁধা। পায়ে নুপুর। বাম বগলে একতারা ও ডান হাতে ডুবকি।

বাবাজী কোনো প্রকার সাদর সম্ভাষণের অপেক্ষা না করিয়া সম্মুখের গাছতলার ছায়ায় আরাম করিয়া বসিল। একখণ্ড ন্যাকড়া মাথায় পাগড়ীর মতো করিয়া বাঁধা ছিল। সেইটা খুলিয়া মুখ মুছিয়া গোঁফ জোড়া মোচড়াইয়া লইল। তারপর একতারাটা কানের কাছে আনিয়া দু'টা ঝঙ্কার দিয়া সুর ঠিক করিল। ডান হাতের ডুবকিটা ডান

হাঁটুতে ঠুকিয়া তাল দিল। এবং প্রসারিত বাঁ পা মাটিতে ঠুকিয়া নুপুর বাজাইল। তারপর গান ধরিল ঃ

হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি,'
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই॥

বিষ্ণুরথ চেয়ারে ভালো করিয়া উঠিয়া বসিল। এ বাউল গায় কি ? মুক্তি কোথাও নাই ? মানুষের মনের কমল ফোটে, ফোটে, ফোটে, —তাহার আর শেষ নাই। সেই কমলের মধুর লোভে স্বয়ং প্রভুও বাঁধা পড়িয়াছেন ?

বাবাজির কণ্ঠ ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু আশ্চর্য্য মধুর! চোখ বুজিয়া বুজিয়া সে যেন সুরে সুরে কেবলই কমলের পর কমল ফুটাইয়া চলিতেছে, তাহারও যেন আর শেষ নাই।

এ অঞ্চলে প্রায় সকল বাবাজিকেই বিষ্ণুরথ জানে, অন্তত মুখ চেনে। কিন্তু ইহাকে যেন নূতন মনে হইল। যাহারা দাবা খেলায় চাল বলিতে-ছিল তাহারাও ইতিমধ্যে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহারা হৈ হৈ করিয়া আবদার ধরিল, আর একখানা বাবাজি, আর একখানা।

ওদিকের কর্ম্মচারীদের ঘর হইতে একটা চাকর একটা সাজা কলিকা আনিয়া বাবাজির সম্মুখে নামাইল দিল। দেখিয়া বাবাজির মুন প্রফুল্ল

হইল। ঝুলি হইতে একটি ছোট্ট কাঠের হুঁকা বাহির করিয়া আপন মনে মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে ধূম পান করিতে লাগিল।

তারপরে আবার একতারায় ঝঙ্কার দিয়া ভাঙা ভাঙা সুন্দর কণ্ঠে গান ধরিল ঃ

আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে!
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,
—রসের লহরী—
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী!
—সাঁইয়ের বাঁশরী—
আমি বাইরে ছুটি বাউল হ'য়ে সকল পাসরি
—ঘর ছাড়িয়ে—
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে॥

গান শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুরথের মন সীমাহীন পথের জন্য উদাস হইয়া উঠিল। গৃহ পরিজনের মমতা, শক্তি ও দম্ভের মোহ জীর্ণ পত্রের মতো খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত মন ধীরে ধীরে ধীরে রসের তিমিরে ডুবিয়া গেল।

গান শুনিয়া ভালো সকলেরই লাগিয়াছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজির আখড়া কোথায়?

কলিকাটা চাকরে বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বাবাজি এক মুখ

ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, আখড়া আর পাততে পেলাম কই বাবু মশায়? ঠাকুর আমাকে পথে বসিয়েছেন।

বাবাজি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, ঘুরতে ঘুরতে, ভাসতে ভাসতে এসে কাল সন্ধ্যেয় আপনার ওই দীঘির ধারে রসিকদাসের আখড়ায় এসে উঠেছি। এখন দেখি, প্রভু আবার কোন পথে টানেন!

বিষ্ণুরথের বন্ধুরা তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। বলিল, আর পথে টানা-টানি শুনছি না বাবাজি। এসে যখন পড়েছ, তখন আর ছাড়ছি না।

বাবাজি এক গাল হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে আপনাদের দয়া হ'লে কি না হয়!

—দয়া যথেষ্ট হবে। তুমি খোদ দয়াময়ের কাছে এসে হাজির হয়েছ। ইনি আমাদের বাবু। ঘর-ছাওয়ানো থেকে আরম্ভ ক'রে যা যা দরকার সব ঠিক ক'রে দিচ্ছেন। কোনো ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। সকালে সন্ধ্যায় বিনোদ রায়কে গান শুনিয়ে যাবে, আর ছুটি ক'রে প্রসাদ পাবে। একা তো? না সঙ্গে—

—আছে বই কি বাবু মশায়। আমরা রসের বেসাতি করি। একা থাকার যো কি!

বাবাজি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া শিশুর মতো হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বন্ধুরা বলিল, তা হোক। তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। মোট কথা, এখান থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। কি বল হে বিষ্টু বাবু?

বিষ্ণুরথকে কিছুই বলিতে হইবে না। গান শোনা পর্য্যন্ত তাহার মন বাবাজির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শুধু গান নয়, তাহার চোখের

হাসিতে, কথা বলিবার ভঙ্গিতে এমন একটি চমৎকার সারল্য আছে যে, মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। বিষ্ণুরথ তখনই কর্মচারীদের হুকুম দিল, আজকের মধ্যেই রসিকদাসের আখড়া সংস্কার করিয়া দিতে হইবে। সংস্কার করিবার বিশেষ কিছু নাই। হয়তো চালে একটু গোঁজাগুঁজি দিতে হইবে। বহুদিন অব্যবহার্য্য পড়িয়া থাকায় উঠানে আগাছা হইয়াছে, সেগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। দরজা-জানালা আশা করা যায় ঠিকই আছে। না থাকিলে বদলাইয়া দিলেই চলিবে। বিশেষ হাঙ্গামা নাই।

বাবাজি এই ব্যবস্থায় খুশী হইয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। বিষ্ণুরথকে দেখিয়া তাহার ভালো লাগিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে দীঘির ধারে এই জায়গাটিও মনোরম। বাবাজি এতদিন পরে একটা মনের মতো জায়গা পাইয়া বাঁচিয়া গেল। ভরসা হইল জীবনের বাকী কয়টা দিন এখানেই রাধাকৃষ্ণের নাম গান করিয়া, আর বিনোদ রায় জিউর প্রসাদ পাইয়া পরমানন্দে কাটিয়া যাইবে।

১৭

দীঘির এধারে লোকালয়, ওধারে রসিকদাসের আখড়া লোকালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। এ অঞ্চলটা একেবারে ফাঁকা। চারিদিকে কেবল ধানের জমি। মাঝে মাঝে দুই একটা আমগাছ, তালের বন অবশ্য আছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব কম। জঙ্গলের বালাই একেবারেই নাই। কেবল রসিকদাস বাবাজির চেষ্টায় ও যত্নে এই স্থানটি ঝোপে জঙ্গলে বড় বড় গাছের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। ফাঁকা মাঠ পার হইয়া এই থানটায় আসিলে নয়ন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ভিতরে গিয়া

বসিলে আর মনে হয় না যে ইহার বাহিরে লোকালয় আছে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী এইটুকুর মধ্যে সম্পূর্ণ। ছোট ছোট পাখীর কিচ্ কিচ্ শব্দে, ভ্রমরের গুঞ্জরণে, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মরে এই ছায়াচ্ছন্ন স্থানটি সর্ব্বক্ষণের জন্য শব্দময়।

এই ছোট্ট জঙ্গলটুকু পার হইলে রাংচিত্রার বেড়া। তারপর ছোট্ট এক টুকরা উঠান, সর্ব্বদার জন্য ঝক্‌মক্ করিতেছে। বাঁ দিকে তুলসী মঞ্চ। তার উপরেই চারিদিকে উঁচু দাওয়াওয়ালা একখানি এক কুঠারী ঘর। পিছনে আরও একটু জায়গা পড়িয়া আছে। বাবাজির আখড়ার সদর খিড়কির বালাই নাই। এখান হইতেও এক সরু পথ সামনের আলে গিয়া পড়িয়াছে। রসিকদাস বাবাজির মৃত্যুর পর সামনের পিছনের দুইটি রাস্তাই ঘাসে ঢাকিয়া গিয়াছিল। নূতন বাবাজির আগমনে আবার লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তাও বাহির হইতেছে।

তখন ছয়টার কাছাকাছি। বেলা শেষ হইতে বড় বাকী নাই। নূতন বাবাজি দাওয়ার উপর একা বসিয়া গুন গুন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছে আর হাটুতে তাল দিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ওদিকে বড় নিমগাছের তলায় যে উঁচু করিয়া বেদী বাঁধানো হইয়াছে তাহার উপর দুপুর বেলা হইতে গ্রামের একদল বকাটে ছোকরা পাশা পাড়িয়াছে। এখনও খেলা শেষ হয় নাই। তাহারা ক্রমাগত বিড়ি ফুঁকিতেছে আর এক একটা পাশার দানে এক এক পক্ষ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এমন সময় বেড়ার আগড় ঠেলিয়া বিষ্ণুরথ প্রবেশ করিল। একা বিষ্ণুরথ, সঙ্গে মোসাহেবের দল নাই।

ছেলের দলের চীৎকার বন্ধ হইল। বাবাজি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

—এই যে বাবু মশায়, আসুন আসুন। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম আমার নতুন আখড়ায় সবাই এলেন, কেবল বাবু মশায়ের পায়ের ধূলো

পড়ল না। আসুন, আসুন, আসুন। অ... কোথায় গেল, রাইমণি?

একটি একুশ-বাইশ বৎসরের অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে উঠান ঝাঁট দিতেছিল সেই রাইমণি। বিষ্ণুরথকে আসিতে দেখিয়া ঝাঁট দেও বন্ধ করিয়া এক দৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল। তাহার দিকে বিষ্ণুরথে দৃষ্টি পড়িতেই তাড়াতাড়ি আসন আনিতে ঘরের ভিতরে গেল।

ছেলেরা তখন পাশার ছক গুটাইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিল বাবাজির পিছু পিছু বিষ্ণুরথ কুটিরের দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিল, এ হতভাগারা কি রোজই এখা আসে না কি?

বাবাজি প্রসন্ন হাস্যে বলিল, আসবে বই কি বাবু...। আম এ রাধাকৃষ্ণের আখড়া, পাঁচজনের আসা-যাওয়া যে চাই!

হ্যাঁ চাই! ছেলেদের কতক কতক ইতিমধ্যেই সরিয়া ...ড়িয়াছিল যে কয়জন ছিল তাহাদেরই ধমক দিয়া বিষ্ণুরথ জিজ্ঞা... কর তোরা এখানে কি করতে আসিস রে হতভাগা? ...র ... কোনোদিন···

বাবাজি তাড়াতাড়ি হাত যোড় করিয়া ব্যাকুলভাবে ...ল, থা থাক্, বাবুমশায়, ওদের কিছু বলবেন না। আহা কৃষ্ণ র...র রসিক,- ওরাই তো আমার ঘর ভাঙে! আসুক, আসুক. সবাই আসবে নইলে ঘর ভাঙবে না যে! পথ পাব কি ক'রে?

বাবাজি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাইমণি দাওয়ায় আস পাতিয়া দিতেছিল। বাবাজির কথায় ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘরের ভিত লুকাইল।

ঘর ভাঙিবারই ব্যাপার! এতগুলি কৃষ্ণরসের রসিক একসঙ্গে ছুটি

লোহার ঘরও ভাঙিয়া যায়। বাবাজি বলিয়াই এতদিন টিকিয়া আছে, অন্য কেহ হইলে কোন্ দিন পথ দেখিত।

আসন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, মনটা ভালো নেই বাবাজি। তোমার গান শুনতে এলাম। একটু অসময় হয়ে গেল বোধ হয়।

বাবাজি একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, বিলক্ষণ! রাধাকৃষ্ণের নাম শোনাব তার আবার অসময় আছে নাকি? একতারাটা দাও তো রাইমণি; বাবু মশায়কে একখানা গান শুনিয়ে দিই।

রাইমণি নিঃশব্দে আসিয়া ডুবকি একতারা বাবাজির পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া গেল।

বাবাজি একতারাতে ঝঙ্কার দিয়া কি মনে মনে করিয়া বলিল, তুমিই একখানা গাও রাইমণি। বাবু মশায় এত কষ্ট ক'রে এসেছেন। আমার গান তো রোজই শোনেন।

বাবাজি একতারাটা ভিতরে পাঠাইয়া ডুবকিতে চাঁটি দিল।

রাইমণি নীরবে একতারাটা লইয়া দরজার ঠেস দিয়া একটু আড়ালে বসিল। বৈষ্ণবের মেয়ে, গান গাহিতে লজ্জা নাই। বলিতে গেলে ইহা শুধু তাহার পেশা নয়, ধর্ম্মের অঙ্গ।

রাইমণি গাহিল:

আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল্, বল্ রে শ্রবণে....
'সে এসেছে, সে এসেছে পূরব গগনে!'
তোরা বল্‌গো ঘ্রাণে বল্, বল্ রে শ্রবনে—
'তোর বন্ধু এসেছে, এসেছে সে পূরব গগনে!'

কমল মেলে কি আঁখি
তারে সঙ্গে না দেখি,
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে।
আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।

রাইমণির গলা বাবাজির মতো ভাঙা-ভাঙা নয়, বাঁশীর মতো মিষ্ট। তাহাকে দেখা যাইতেছিল না, তবু মুখখানি তো দেখা। কিন্তু গানের কথা ও সুর তাহাকে বর্তমানের সকল কিছু হইতে ঠেলিয়া পিছাইয়া দূর অতীত কালের বিরহিনীর কাছে পৌছাইয়া দিল, যে বন্ধুকে প্রথমে না দেখিয়া কিছুতেই চোখ মেলিবে না।

গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু হাওয়ায় তখনও সুরের রেশ ফুরাইয়া যায় নাই। ফুলে ফুলে তখনও থাকিয়া থাকিয়া শিহরণ উঠিতেছিল।

বিষ্ণুরথ অনেকক্ষণ পরে শুধু বলিল, বেশ।

বাবাজি ডুবকি রাখিয়া খুঁটিতে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল; বিষ্ণুরথের কথায় চোখ মেলিয়া চাহিয়া হাসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া রাইমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল একতারাটা বাবাজির কাছে নামাইয়া রাখিয়া উঠানে গামছা ও কলসী পড়িয়াছিল তাহা কক্ষে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাবাজি একতারা হাতে বহুক্ষণ নিঝুম হইয়া মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া রহিল। বিষ্ণুরথেরও কথা কহিতে ভালো লাগিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে বাবাজি হাসিয়া বলিল, এর পর আর আমার গান জমবে না। কি বলেন বাবু মশায়?

বিষ্ণুরথ একটু ইতস্তত করিল। দুই জনেই ভালো গায়। তার মধ্যে

কে বেশী ভালো গায় বলা কঠিন। বিষ্ণুরথ কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, কেন ? তুমিও তো ভালোই গাও বাবাজি।

বাবাজি একতারা-ডুবকি স্পর্শও করিল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, না। এর পর আর গান জমে না। আজকে এই থাক বাবু মশায়, আমার গান আর একদিন আপনাকে শোনাব।

বিষ্ণুরথের মনে হইতেছিল, এই থাক ! এমন গান একখানি শোনাই ভালো। সে আরও একটুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল।

রাংচিতার বেড়ার পরেই একটি সরু পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া দীঘির উঁচু পাড় অতিক্রম করিয়া ঘাটে পড়িয়াছে। এ ঘাটে আর কেহ নামে না। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বড় জোর দুই একটি রাখাল কি দুই একটি গরু বাছুর নামিয়া জল পান করিয়া যায়। ঘাটটি বিশেষ করিয়া বাবাজির আখড়ার সদর এবং খিড়কির ঘাট। জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়াই বিষ্ণুরথ দেখিল, কক্ষে জলভরা কলসী লইয়া সিক্ত বস্ত্রে রাইমণি হন হন করিয়া আসিতেছে।

কাছাকাছি আসিতেই বিষ্ণুরথ পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোনো। এ সব গান তুমি কোথায় সংগ্রহ ক'রেছ ?

রাইমণি তাহার প্রশ্নে চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলো তাহার অনবগুণ্ঠিত সুন্দর মুখের উপর পড়িল। আস্তে আস্তে বলিল, কত জায়গায় কত গান পেয়েছি, তা কি আর মনে থাকে বাবু মশায় ?

—হুঁ। আর এই বাবাজিটির সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল ?

রাইমণি বাবাজির প্রসঙ্গে কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, এমনি একদিন পথে পথেই আলাপ আর কি!" পথ ছাড়ুন সন্ধ্যে ব'য়ে যায়।

—হ্যাঁ

বলিয়া বিষ্ণুরথ চলিয়া গেল। একবার মনে হইল বলে, তোমার গান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার আর সময় পাইল না।

অতঃপর বিষ্ণুরথের আখড়া পরিদর্শন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম দুই একদিন অন্তর যাইত। এখন প্রত্যহ যায়। বন্ধুরা ইহা লইয়া হাস্য পরিহাস আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুরথ সে সমস্ত গ্রাহ্য করে না, হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। কথাটা কাজলীরও কানে পৌঁছিয়াছে। সে মুখে কিছুই বলিতেছে না, ঈশানের মেঘের মতো থম্ থম্ করিতেছে। যে কোনো মুহূর্ত্তে বর্ষণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিষ্ণুরথ আর সে দিক মাড়াইতেছে না। বেচারা মনে মনে লজ্জা পায়। চেষ্টা করে আখড়ার দিকে আর যাইবে না। কিন্তু পারে না, বিকাল হইলেই কে যেন তাহার পা দুইটাকে টানিয়া লইয়া যায়। আরও মুশ্‌কিল হইয়াছে, বাবাজির সদাহাস্যময় মুখ দেখিয়া বিন্দুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই যে, তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। তাহা হইলেও বিষ্ণুরথ কোনো রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারিত।

সেদিন বিষ্ণুরথ যাইতেই রাইমণি আসন পাতিয়া দিয়া অদূরে বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিষ্ণুরথ এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজি কোথায়?

—চুলোয়।

বিষ্ণুরথ তাহার উত্তর দিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কাছের চুলোয়, না দূরের চুলোয় ?

রাইমণি আয়ত চোখে বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল, তার মানে দূরের চুলো হ'লে বুঝি ঘরে বসতেন ?

বিষ্ণুরথ বিভ্রান্ত ভাবে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

রাইমণি গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, না।

বিষ্ণুরথ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। রাইমণি উঠিয়া বলিল, বসুন। সন্ধ্যেটা দিয়ে নিই।

রাইমণি দীপ জ্বালিয়া তুলসী তলায় গড় হইয়া প্রণাম করিল। তারপর সেই প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া বিষ্ণুরথের মুখের কাছে একবার ঘুরাইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, দুপুরে বেলায় গেছে, এখনও ফিরল না কেন কে জানে!

—তাই ভাবনা হচ্ছে ?

রাইমণি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, তা হবে না ? আপনি না হয় আরও একটু থাকবেন। সমস্ত রাত তো আর আমাকে পাহারা দিতে পারবেন না!

বিষ্ণুরথ চোখ টিপিয়া বলিল, একটা রাতই তো না হয় দিলাম।

অন্য দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে রাইমণি বলিল, হুঁ। তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি! দুপুর রাত্রে গিন্নী এসে ঘাড় ধ'রে নিয়ে যাবে। তখন ?

কাজলীর কথায় বিষ্ণুরথ সত্য সত্যই ভয় পাইয়া গেল। সে যে রকম জেদী মেয়ে, সব পারে।

কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, রাইমণি, বাবাজিকে সত্যি সত্যি পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছ ? না····

—সত্যি সত্যিই পথ থেকে।

—পথেই আলাপ, পথেই মালাবদল ?

—হুঁ।

বিষ্ণুরথ আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা রাইমণি, বাবাজি যদি আর না ফেরে ? ওরা তো পথের পথিক, ঘরে ফেরার তাগিদ কিছু নেই।

এ সম্ভাবনা যেন নূতন কিছু নয়, এমনি নিশ্চিন্তভাবে রাইমণি উত্তর দিল, তখন আপনি তো আছেন ?

—আমার ওপর ভরসা করতে পার ?

—না পেরে উপায় কি ?

ইহার উপর আর কথা নাই। বিষ্ণুরথ নিরুত্তরে রাইমণির সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এমন সময় বাবাজির গলা শোনা গেল, রাইমণি, রাইমণি গো !

রাইমণি ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল।

বিষ্ণুরথকে দেখিয়া বাবাজি আশ্বস্তভাবে বলিল, এই যে খা মশায় রয়েছেন ! রাইমণি একলা আছে বলে আমি যে কি তাড়াতাড়ি আসছি ! কৃষ্ণ হে ! প্রাণ গৌর ! বেশ বেশ !

রাইমণি বাবাজির পা ধোয়ার জল আনিয়া দাওয়ার উপর রাখিল কলিকায় তামাক সাজাই ছিল। টিকায় আগুন ধরাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বলিল, বাবু মশায় ভাবছিলেন তুমি যদি আর না ফেরো।

বাবাজি পা ধুইতে ধুইতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল না ফেরাই বটে। পথে বেরুলে আর ইচ্ছে হয় না ঘরে ফিরি।

রাইমণি বলিল, তাতে আমিও ভয় পাই না। বাবু মশায় আমার ভার নিতে খুব পারবেন।

বাবাজি আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

—তা পারবেন। বাবু মশায় কৃষ্ণ রসের রসিক আছেন। তোমার ভার নিতে খুব পারবেন। কৃষ্ণ হে! প্রাণ গৌর!

কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুরথ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ইহারা কি তাহাকে লইয়া পরিহাস করিতেছে? অথবা এই ব্যাপারটা ইহাদের কাছে অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছে?

—রাইমণি, বাবু মশায়কে একটা গান শুনিয়ে দাও।

বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, আজ থাক বাবাজি। রাত হয়েছে। এইবার উঠি।

বাবাজি ব্যস্ত হইয়া বলিল, সে কি কৃষ্ণনাম গান একটু শুনবেন না?

রাইমণি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, না, না। আর একদিন শোনাব বরং। রাত হয়নি? উনি তো রোজই আসেন, গান শোনার ভাবনা কি?

বাবাজি অগত্যা বলিল, তা'হলে বাবু মশায়কে আলোটা একটু দেখিয়ে এস বরং। অন্ধকার হ'য়েছে। এই জঙ্গলটাও বড় ভালো নয়।

রাইমণি আলো লইয়া আগে আগে চলিল। জঙ্গলটা সত্যিই অন্ধকার। সাপ খোপের ভয়ও আছে। নিঃশব্দে জঙ্গলটা পার হইয়া খোলা মাঠে আসিয়া রাইমণি দাঁড়াইল।

হাসিয়া বলিল, এইবার যেতে পারবেন তো? না, আরও এগিয়ে দিতে হবে?

বিষ্ণুরথ কি যেন ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে বিড় বিড়

করিয়া কি বলিল বোঝা গেল না। রাইমণির দিকে একবারও ফিরিয়া না চাহিয়া, এতখানি পথ আলো দেখানোর জন্য একটাও ধন্যবাদের কথা না কহিয়া সোজা গ্রামের পথ ধরিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। রাইমণি আরও কিছুক্ষণ আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আখড়ার দিকে চলিল।

উপরের শয়ন কক্ষে আসিয়া বিষ্ণুরথ দেখিল কাজলী একটা সোফায় বসিয়া একখানা মাসিকপত্র পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি মাসিকপত্র বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বিষ্ণুরথ তাহার মুখের দিকে চাহিতে, কিম্বা একটা কথা কহিতে সাহস করিল না। তবু কোনোদিকে না চাহিয়াও বুঝিল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

তাহার খাবার বরাবরই ঢাকা থাকে। সে নিঃশব্দে ঢাকা খুলিয়া আহারে বসিল। খাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না। না হয় তুইটা মুখে দিয়া নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। বাবাজির আবির্ভাবের কয়দিন পর হইতেই কাজলী পৃথক বিছানায় শুইতেছে। কাজলীর ক্রোধ শান্তির আগ্রহ বিষ্ণুরথের যথেষ্টই আছে। কিন্তু ভয়ে সে একটা মিষ্টি কথা বলিতেও সাহস পায় নাই। কাজলী যা মেয়ে এবং মেঘ যেমন নামিয়াছে, তাহাতে একবার বর্ষণ আরম্ভ হইলে বিষ্ণুরথ মাথায় ভাসিয়া যাইবে।

বিছানায় শুইয়া কাজলীর অগ্নিগর্ভ চোখ বারে বারে মনে পড়িতে লাগিল। তাহারই পাশে কল্পনা করিল ছোট পাহাড়ী নদীর মতো হাস্যসঙ্গীতমুখরা রাইমণিকে। এই তুইজনের মধ্যে অকস্মাৎ অকারণে মনে পড়িল অনুভাকে, ললিতলবঙ্গলতার মতো অনুভাকে। বিষ্ণুরথ বিস্মিত হইয়া আবিষ্কার করিল, এই মেয়েটির সম্বন্ধেও তাহার মনে মোহ জন্মিয়াছিল। আশ্চর্য্য! তাহার নিজের মনের এই ছোট ভূমিকম্পের

খবর তাহার নিজের মনেই পৌছায় নাই, অথচ কাজলীর সিস্‌মোগ্রাফে ধরা পড়িয়াছিল।

১৮

পরদিন সকালে উঠিয়াই বিষ্ণুরথ যে সংবাদ পাইল তাহাতে সে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। বাবাজি রাইমণিকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। যাওয়ার সময় কাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয় লোক উঠিবার পূর্ব্বেই রাত থাকিতে চলিয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুরথ আখড়ায় গিয়া দেখিল আখড়া খাঁ খাঁ করিতেছে। ঘরের মধ্যে জিনিস পত্রের বাহুল্য কিছু ছিল না। দুটি লোকের পক্ষে নিতান্ত যা না হইলে নয় তাহাই মাত্র ছিল। সে কয়টা জিনিস ঝোলাতেই দিব্য আঁটিয়া যায়। পড়িয়া আছে মাত্র, যে মাটির কলসী লইয়া রাইমণি জল আনিতে যাইত সেইটা। এখনও জল ভরাই আছে। কয়েক ঘণ্টা হইল মাত্র গিয়াছে ইহারই মধ্যে উঠানটির দিকে যেন চাওয়া যায় না। কেমন শ্রীহীন দেখাইতেছে। বিষ্ণুরথ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থান খুঁজিল। কোথায় যে তাহারা গেল রাইমণি তাহার একটা চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই,—একখানা চিঠি, কিম্বা একটা সঙ্কেত, কিছুই না। বিষ্ণুরথের ধারণা জন্মিল, বাবাজির দূরে বাহির হইয়া যাওয়াটা কিছুই নয়, সে কেবল আর একটি মনের মতো আখড়ার অন্বেষণে গিয়াছিল।

এখন কথা এই যে, রাইমণি এ সংবাদ পূর্ব্বেই জানিত, কি জানিত না? তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, অথবা সে স্বেচ্ছায় গিয়াছে? এতদিন যে মেলামেশা সে তাহার সঙ্গে করিল তাহা কি শুধুই খেলা, না তাহার মধ্যে সত্যবস্তু কিছু ছিল? কিন্তু রাইমণি নাই, এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবারও উপায় নাই।

মনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে ইহাদের অন্তর্দ্ধানে বিষ্ণুরথ লজ্জিত হইয়া পড়িত। কিন্তু দীর্ঘ দিনের মানসিক সংগ্রামে মানুষ এমন একটি চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়, যখন আর লজ্জা বলিয়া কিছু থাকে না। বিশেষ রাইমণিকে লইয়া তাহার সম্বন্ধে পাঁচ জনের কানাঘুষা এবং সত্য মিথ্যা নানাপ্রকার জনরব শুনিয়া চোখের লজ্জা এমনিতেই তিলে তিলে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। সে আখড়ার ঘর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া এবং নানা লোককে নানা প্রশ্ন করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে, যাহার কিছুমাত্রও লজ্জা আছে সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া সরিয়া পড়িল।

কয়দিন বিষ্ণুরথ উদভ্রান্তের মতো কাটাইল। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল। সামনে পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মধ্যে নিজেকে একেবারে মগ্ন করিয়া রাখিল।

ইতিমধ্যে একটা পূজার হিসাবের কয়েকখানা পুরাতন খাতা তাহার হস্তগত হইয়াছে। তখনকার দিনে জিনিসপত্র সস্তা ছিল, খরচ অনেক কম হইত। আগে যাহা যাহা ব্যবস্থা ছিল এখনও তাহাই আছে। কেবল একটা মোটা খরচ কমানো হইয়াছে। তাহার পিতামহের আমল হইতে যতদূর পর্য্যন্ত খাতা পাওয়া গিয়াছে সর্ব্বত্র দেখা যায় কোথাও বাই কোথাও খেমটা নাচের জন্য মোটা টাকার বরাদ্দ আছে। তাহার পিতামহের আমল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। দেখা যাইতেছে তাহার পিতার আমলেই ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

খবরটা বন্ধুবর্গের কানে যাওয়ামাত্র তাহারা হৈ হৈ করিয়া উঠিল। আগে এই প্রকার প্রসঙ্গ বিষ্ণুরথের সামনে উত্থাপিত করিতে কেহ সাহসই করিত না। কিন্তু রাইমণির আবির্ভাবের পর হইতে তাহাদের ভয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন অবাধে এ সমস্ত আলোচনা চলে। তাহারা বিষ্ণুরথকে আর স্থির হইতে দিল না! এবং বিষ্ণুরথের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই স্থির করিয়া ফেলিল, শহর হইতে কোন্ কোন্ খেমটাওয়ালীকে বায়না দেওয়া হইবে। বিষ্ণুরথ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, ইহারা গ্রামে থাকে বটে, কিন্তু শহরের খেমটাওয়ালীর খবরও রাখে, এমন কি, বোঝা গেল, কয়েকজনের তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় পর্য্যন্ত আছে।

রাইমণির ঘটনাটা লোকের মুখে মুখে এবং বন্ধুবর্গের রসালাপে এমন কদর্য্যভাবে রটিয়া গিয়াছিল যে, বিষ্ণুরথের লোকলজ্জা ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে প্রথমে একটু আপত্তি করিয়া অবশেষে রাজি হইয়া গেল। বাস্তবিক জমিদারের বাড়ীর পূজা একটা কিছু না হইলে মানায় না। বিশেষ বন্ধুবর্গ যখন আশ্বাস দিয়া গিয়াছে যে, যাহাকিছু করিবার সমস্ত তাহারা করিবে, সে শুধু টাকাটা বাহির করিয়া দিয়াই খালাস, তখন আর চিন্তা করিবার কি আছে?

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনটি দিনের জন্য বায়না দেওয়া হইবে। তাহাদের বাড়ী হইতে খানিকটা দূরে যে বাগানবাড়ী আছে সেইখানে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে। বাস্তবিক বাগানবাড়ীটা তাহার পিতার আমলে তৈরী হওয়ার পর হইতে এমনভাবে আর কখনও কাজে লাগে নাই।

বিষ্ণুরথকে কিছুই দেখিতে হইল না, বন্ধুরা দুই দিনের মধ্যে বাড়ীখানা চুনকাম ও সামনের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া, ফরাস-তাকিয়া,

আয়না-ঝাড়-লণ্ঠন-ছবিতে সাজাইয়া ঠিক করিয়া ফেলিল। এমন কি পুকুর ধারে বসিবার জন্য বেদীটায় যে ফাট ধরিয়াছিল এই উপলক্ষে তাহা পর্য্যন্ত মেরামত হইয়া গেল।

ষষ্ঠীর দিন বায়নার টাকাটা বন্ধুদের হাতে গণিয়া দিয়া বিষ্ণুরঞ্জ নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিল।

কথাটা কাজলীর কানে গিয়া যখন পৌঁছিল তাহার মনের অবস্থা যে কি হইল সে গোপন কথা শুধু তাহার অন্তর্যামীই জানিলেন। কাঁদিয়া হাট বাধাইবার মেয়ে সে নয়। এ বাড়ীর সেই ঘরণী গৃহিণী, সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পৃথিবীর অদ্বিতীয়া রূপসীও সে সম্মানিত আসন হইতে তাহাকে এক চুলও নড়াইতে পারিবে না। বারম্বার নিজেকে নিজে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীকে তাহার কোন কথা বলিবার নাই,—একটা কথাও না। সে নিতান্ত অপরিণতবুদ্ধি বালক নয়। বার বার যদি পথ ভুলিয়া মরে, তাহার জন্য কাজলী কেন কাঁদিয়া কাটিয়া, রাগ করিয়া অভিমান করিয়া নিজেকে নীচু করিবে? যাচিয়া সোহাগ করার মতো হীনতা নারীর আর নাই।

নীচে রান্নাঘরে, খিড়কীর ঘাটে, এখানে সেখানে ঠাকুরে চাকরে ঝিয়ে ইহা লইয়া টেপাটেপি, হাসাহাসি চলিতেছে চলুক। সে বাড়ীর গৃহিণী, অত কানাঘুষায় মন দিবার মতো অবসর তাহার নাই। তাহার মুখে-চোখে এজন্য কোনো প্রকার লজ্জা বা কুণ্ঠার চিহ্ন প্রকাশ পাইলে চলিবে না। সে যখন নীচে নামিবে তাহার মুখ দেখিয়া কেহ বুঝিতেই পারিবে না যে, গ্লানিকর কোনো ঘটনা ঘটিতেছে। তাহার পায়ের শব্দে দাসী চাকর তটস্থ হইয়া আপন কাজে মন দিবে। তবে না সে গৃহিণী?

এমনি করিয়াই কাজলীর দিন চলিতে লাগিল। কোথাও কোনোরূপ ব্যতিক্রম দেখা গেল না। বাড়ীতে পূজা, তাহার তিলার্দ্ধ বিশ্রামের সময়ও নাই। সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে স্নান সারিয়া সে পূজার দালানে ঢোকে, যখন শুইতে আসে তখন রাত্রি একটা, দুইটা, কি তারও বেশী। তারপরে রুদ্ধদ্বার গৃহকোণে সঙ্গীহীন শয্যায় শুইয়া যদি দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়াই পড়ে, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

এমনি করিয়া ষষ্ঠী কাটিল। সপ্তমীর রাত্রে জাফরী-কাটা ঢাকা-বারান্দায় নিজের বিশিষ্ট আসনে বসিয়া আর সকলের মতো সহজভাবে খেমটা-নাচও দেখিয়া আসিল। অষ্টমীর দিন সকালে এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত।

টেলিগ্রাম বিষ্ণুরথের নামে। নিত্যরূপ জানাইয়াছে উভয়ের জননীকে লইয়া সেইদিন বিকালের গাড়ীতে সে আসিয়া পৌছিবে। স্টেশনে যেন ব্যবস্থা থাকে।

বড়দিনের পূর্ব্বে তাঁহারা পৌছিবেন না এই প্রকারই কথা ছিল। হঠাৎ তাহার পরিবর্ত্তন হইল কেন কে জানে? কাজলী টেলিগ্রাম পাইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িল। সময় অল্প। স্টেশনে লোক পাঠানো, পাল্‌কী বেহারার ব্যবস্থা করা, এসব তাহার কাজও নয়। অগত্যা হালদার মহাশয়কে ডাকাইয়া পাঠাইল।

হালদার মহাশয়ও ব্যস্ত। কাজের চাপে তাঁহারও নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। পূজার হাঙ্গামা তো বড় সহজ নয়! কোথাও কোথাও ছুটাছুটি করিতেছিলেন। কাজলীর ডাকে ঘণ্টা খানিক পরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

—কি দিদিমণি?

কাজলী নিঃশব্দে টেলিগ্রামখানি তাঁহার হাতে দিল।

টেলিগ্রাম দেখিয়া ভদ্রলোকের মুখ শুকাইয়া গেল। এপিঠ-ওপিঠ উল্টাইয়া কাজলীর হাতে ফেরৎ দিয়া বলিলেন, ও সব ইংরিজি তো বুঝতে পারবো না। কী ব্যাপার বল দেখি? খারাপ কিছু নয় তো?

কাজলী বলিল, দাদা পাঠাচ্ছেন। মা'রা সব আসছেন বিকালের গাড়ীতে। স্টেশনে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

হালদার মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, পূজো বাড়ী, কে যে কোথায় আছে তার ঠিক নেই। তা হোক, তার জন্যে ভাবনা কি? আমি এখনি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

হালদার মহাশয় চলিয়া যাইতেছিলেন। কাজলী ডাকিয়া বলিল, দু'খানা পালকীর ব্যবস্থা করবেন হালদার দাদা। মনে হচ্ছে, সবাই আসছেন।

হালদার মহাশয় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, গিন্নীমাও আসছেন না কি?

টেলিগ্রামখানা নাড়িয়া কাজলী বলিল, স্পষ্ট ক'রে কিছুই লেখা নাই। তবে তাই মনে হচ্ছে।

—বেশ, বেশ!

হালদার মহাশয় মাথা নাড়িতে নাড়িতে ব্যবস্থা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় নিত্যরূপ, তাহার মা ও বিষ্ণুরথের মা আসিয়া পৌঁছিলেন। হালদার মহাশয়ের সুব্যবস্থায় পথে তাঁহাদের কোনো কষ্ট হয় নাই। কিন্তু এইবার কাজলীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। দাসী

চাকরের কাছে সম্মান ও গাম্ভীর্য্য রাখা সহজ। কিন্তু ইহাদের কাছে লজ্জা বাঁচাইবে কি করিয়া?

নিত্যরূপ ও তাহার মাকে বিষ্ণুরথের মা কিছুতেই বাড়ী যাইতে দিলেন না। সকলে ঠাকুর প্রণাম করিয়া ভিতরে আসিলেন। কাজলী তাঁহাদের প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

—বিষ্টুকে দেখছি না বৌমা? সে গেল কোথায়?

কাজলী কোনো উত্তর না দিয়া তাঁহাদের পা ধোয়ার জল আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। একটা চাকর একটা বড় ঘড়ায় জল লইয়া আসিল। কাজলী তীর্থপ্রত্যাগত শাশুড়ী ও মায়ের পা নিজ হাতে ধুইয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল।

বলিল, আপনারা গা ধুয়ে আসুন মা। আমি মায়ের প্রসাদ ঠিক ক'রে রাখছি। সমস্ত দিন তো আর....তোমাকে আর এই অবেলায় গা ধুতে হবে না দাদা। চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি। তুমি ওপরের ঘরে গিয়ে বসগে। আমি এক্ষুণি চা নিয়ে আসছি।

—অ বৌমা, বিষ্টু আবার কোথায় গেল?

কাজলী সে কথা যেন শুনিতেই পাইল না। ব্যস্তভাবে দাদার জন্য চা আনিতে গেল।

তথাপি নিস্তার নাই। মা ও শাশুড়ী গা ধুইতে চলিয়া গেলেন। কাজলী উপরের ঘরে চা লইয়া আসিতেই নিত্যরূপ জিজ্ঞাসা করিল, বিষ্টু কোথায় রে? তাকে দেখছি না?

চায়ে কি একটা বোধ হয় পড়িয়াছিল কাজলী একটা চামচ দিয়া তাহা মনোযোগের সঙ্গে তুলিতে লাগিল। উত্তর দিল না। নিত্যরূপ মনে মনে হাসিয়া জলযোগে মন দিল। স্বামীর প্রসঙ্গে কাজলীর লজ্জা হইতেছে।

কিন্তু একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়াই নিত্যরূপের হাসি মিলাইয়া গেল। উপরের একটা ঘরে কাজলী নিত্যরূপের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল, নিত্যরূপ শুষ্কমুখে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কি শুনছি রে ? উঁ ?

কাজলী একমনে বিছানা করিতেছিল। নিত্যরূপের ব্যাকুলকণ্ঠে ভয় পাইয়া বলিল, কি আবার শুনছ ?

—খেমটা এসেছে না কি ? বিষ্টু শুনলাম....

কাজলী তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া বিছানার চাদরটা ঝাড়িতে লাগিল।

কিন্তু নিত্যরূপও ছাড়িবে না। ঘুরিয়া সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ অধঃপতন কতদিন থেকে হ'য়েছে ? উঁ ? তুই বা জানাস নি কেন ? এসব কি আরম্ভ হয়েছে ?

কাজলী আর পারিল না। সেইখানে বিছানার উপর উপুড় হইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নিত্যরূপ তাহার পাশে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, ভয় কি ! আমি এসে পড়েছি, আর ভয় নেই। বোকা মেয়ে, আগে জানাতে হয় ! তাহ'লে কি আর এত কাণ্ড হয় !

কিন্তু কাজলী আর মাথা তুলিল না।

নিত্যরূপ বলিল, আমার তো এখন আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মাউই মা সেতুবন্ধ থেকে ফিরে এসে বেশ ছিলেন। কিন্তু যেই শুনলেন ষষ্ঠী, আর কিছুতে থাকতে চাইলেন না। শেষে ওঁর জন্যে বাধ্য হ'য়ে আমাকে ছুটি নিতে হ'ল।

কাজলী তথাপি মাথা তুলিল না।

নিত্যরূপ বলিল, ভেবেছিলাম মাউই মা থাকতে পারবেন না। কিন্তু বেশ ছিলেন। একদিনও তোদের নামও করতেন না।

নিত্যরূপ হাসিল। বলিল, যাবি আমার সঙ্গে? চল্ না, দিন কয়েকের জন্যে ঘুরে আসবি?

কাজলী তদবস্থায় থাকিয়াই মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

নিতরূপ উঠিয়া বলিল, দেখি বিষ্টুর উন্নতি কতদূর হ'ল। বাগান বাড়ীতে আছে, না?

কাজলী উত্তর দিল না।

বাগানবাড়ীতে বিষ্ণুরথ বেশ জমিয়া বসিয়াছিল।

তাহার দুই পাশে দুইজন ঘেমটাওয়ালী। সামনে মদের বোতল ও গ্লাস। বাঁয়া-তবলা ও হারমোনিয়াম লইয়া দুজন বন্ধু দুই পাশে। অষ্টমীর রাত্রে আর পূজার দালানে নাচের বৈঠক নাই। সুতরাং বিকাল হইতেই জোর আসর চলিতেছে। বিষ্ণুরথ সপ্তমীর দিন হইতে সেই যে বাগানবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে আর বাহির হয় নাই। স্নানাহার সমস্তই এইখানে। স্নানটা অবশ্য ঠিকই হইতেছে। আহারেরই প্রয়োজন হইতেছে না। মাঝে মাঝে এটা-ওটা, এবং বাকী চব্বিশ ঘণ্টা মদের উপরই চলিতেছে। তবে ভয়ের কারণ নাই। বন্ধুদের মধ্যে দুই একজন আছে যাহারা এ বিষয়ে বিশেষ পরিপক্ক। কখন কতটুকু দিলে বিষ্ণুরথ বেহুঁশ হইবে না—সেদিকে তাহারা খরদৃষ্টি রাখিয়াছে।

তুঁদের উপর নাচ-গান চলিতেছে। দর্শকদের ঘন ঘন চীৎকার ও করতালিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো নিত্যরূপ আসিয়া উপস্থিত।

ডাকিল, বিষ্ণুরথ!

আসরশুদ্ধ লোক সে গর্জ্জনে চমকিয়া উঠিল। নিত্যরূপের চোখে

এবং চেহারায় কি যেন ছিল। নর্ত্তকীরা অজ্ঞাতসারেই নাচ বন্ধ করিয়া অবাক হইয়া নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তে কলরব-মুখর মজলিস নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ করিতে লাগিল।

বিষ্ণুরথের চোখ তখন জবা ফুলের মতো লাল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া তবে যেন সে নিত্যরূপকে চিনিতে পারিল। টলিতে টলিতে উঠিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, নিত্যদা!

নিত্যরূপ ঘরের চারিদিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, এ সব হতভাগা এখানে জুটল কি ক'রে?

বিষ্ণুরথ তখন একেবারেই সজ্ঞানে নাই। জড়িতকণ্ঠে বলিল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এদের শহর থেকে আনা হ'য়েছে। ওয়াণ্ডারফুল নাচে। আর এঁরা আমার মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।

মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডরা তখন অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছে। কেবল অতিরিক্ত বন্ধুবৎসল যাহারা তাহারা বন্ধুকে বাঘের মুখে ফেলিয়া পলায়ন করিতে পারে নাই। তাড়াতাড়ি মদের বোতল ও গ্লাস লুকাইতে ব্যস্ত। আরও দু'জন পালায় নাই। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সকাল হইতে তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। কাল সকালের পূর্ব্বে তাহাদের ঘুম ভাঙিবে বলিয়া মনে হয় না।

শান্তস্বরে নিত্যরূপ বলিল, তোমার মা এসেছেন জানো?

বিষ্ণুরথের পা টলিতেছিল। আর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। পিছু হটিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিল, এসেছেন? So glad.

বিষ্ণুরথের স্পর্দ্ধা ও নির্লজ্জতায় নিত্যরূপের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। অসহ্যক্রোধে তাহার মুখের বাক্য বন্ধ হইয়া গেল।

বিষ্ণুরথ বলিল, একটু বসবেন না? একখানা গান....

সামনের ফরাসে পা দিতেও নিত্যরূপের ঘৃণা বোধ হইতেছিল। দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, এ দিকে এস।

সে কণ্ঠস্বরে বিষ্ণুরথ ভয় পাইয়া গেল। ব্যাকুলভাবে দেওয়ালটাকেই মুঠায় চাপিয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে সভয়ে ঘাড় নাড়িল।

নিত্যরূপ আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। লাফ দিয়া বিষ্ণুরথের একখানা হাত চাপিয়া ধরিতেই বিষ্ণুরথ একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

কিন্তু নিত্যরূপ তথাপি ছাড়িল না। দুইজন চাকর মজা দেখিবার জন্য দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল। নিত্যরূপ হাত-ইসারায় তাহাদের ডাকিয়া বলিল, তোল্।

ঘর তখন একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। নর্তকী দুই জন ভয়ে কোণে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। নিস্তব্ধ ঘর। কেবল নিদ্রিত দুইজনের ভারী নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা যাইতেছে। ইহারই মধ্যে দুইজন চাকর বিষ্ণুরথের এলায়িত দেহ কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিল।

বিষ্ণুরথ পিট্ পিট্ করিয়া একবার চাহিয়া দেখিল ক্রোধে ও ক্ষোভে নিত্যরূপের চোখ বাঘের মতো জ্বলিতেছে। দেখিয়া সে ভয়ে চোখ বন্ধ করিল; একবার আপত্তি করিতেও সাহস করিল না।

শেষ